মহিলা-মজলিস

(আটজন লেখিকার মিলিত উপন্যাস)

লেখিকা—

শ্রীবিমলা দেবী

শ্রীপ্রভাদেবী গঙ্গোপাধ্যায়

রাণী স্নুরুচিবালা চৌধুরাণী

শ্রীপূর্ণশশী দেবী

শ্রীপ্রমীলা রায়

শ্রীহাসিরাশি দেবী

শ্রীপ্রভাবতী সরস্বতী

শ্রীঅমলা দেবী

জ্ঞান পাবলিশিং হাউস

৪৪, বাদুড় বাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

ফেব্রুয়ারী —১৯৪৬

প্রকাশক—
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
জ্ঞান পাবলিশিং হাউস
৪৪, বাদুড় বাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

দেড় টাকা

1596

দাস গুপ্ত এণ্ড কোং
৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট,
ও অন্যান্য বড় বড়
পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য

জ্ঞান প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৪৪, বাদুড় বাগান ষ্ট্রীট্ কলিকাতা
শ্রীবিজয়নারায়ণ দাস পাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত

1494

উপহার

আমার

....

....................................কে

....নিদর্শন স্বরূপ

উপহার দিলাম

শ্রী...

মহিলা-মজলিস



লেখিকা—শ্রী বিমলা দেবী

ধর্ম্ম-বন্ধনের অনুষ্ঠানে একটুও ত্রুটী হয়নি। কুষ্ঠি ঠিকুজী, পুরুত, নাপিত, শালগ্রাম শিলা, মোনামুনি, হাই-আমলা, বাদ পড়েনি একটাও। প্রথম ধর্ম্ম দেনা পাওনা, তাতেও ফাঁকি ছিলনা! সবই ছিল, তবু যে কেন এমন হ'ল কে জানে!

মা ত শয্যা নিলেন; বিধবা পিসিমা সরবে চীৎকার জুড়ে দিলেন; পাড়ার ঠান্‌দি অবধি সহানুভূতির আতিশয্যে 'ভাঙ্গা হেঁটো'য় এ-পাড়া ও-পাড়া ঘুরে সংবাদটা প্রচার করে এলেন।

বাপের কপাল কুঁচকে এল, কলেজ ফেরতা ভাইরা নাক মুখ সিঁটকে ভগ্নিপতির সম্বন্ধে যে-সব মন্তব্য করলেন, সেগুলো কোন ক্রমেই শ্রুতিমধুর নয়। সখীদের 'আহা'র ও অভাব হ'ল না।

কিন্তু লতিকা স্তব্ধ! ওর তরুণ মনের কল্পে কল্পে রঙ্গীন আকাশে অপমানের কালি বেদনার ঢেউ তোলেনা, নিষ্ফল ক্ষোভ, দুস্তর অসম্মানের কাঠিন্য আনে। নিজের দুরদৃষ্টকে ধিক্কার দেয় কিনা কে জানে, স্বামী নরেশের সম্বন্ধেও যে কি ভাব জাগে বোঝা যায়না; কিন্তু স্তব্ধতাটা যে বিরহের নয়, অপমানিত অন্তর আত্মার সেটী বোঝা যায়।

দেখতে আসার দিন থেকে অষ্টমঙ্গলার শেষ দিন অবধি স্বামীর কথা ভাবতে গেলেই মনে পড়ে তার অতিরিক্ত বিরক্তি, অনাবশ্যক ঔদ্ধত্য।

বাসর ঘরে নরেশের ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস। আর উঠে যাবার অস্বাভাবিক আগ্রহ, লতিকার মনে যে বিস্ময় জাগিয়েছিল, বৌভাত, আর ফুলশয্যার অভিজ্ঞতায় সেই বিস্ময়ই ওর সমস্ত মনকে নরেশ সম্বন্ধে বিমুখ করে তুল্লে। বিবাহের কোন অনুষ্ঠানকেই যেন ও গ্রাহ্য করে না, ভাবটা এম্‌নি ধারা। ফুলশয্যার দিন মেয়েদের পক্ষ থেকে লতিকার হাতের রাঙা-রাখীর ডোর খুলবার অনুরোধ শুনে সেই যে নরেশ রাগ করে বাইরে গিয়ে বসেছিল, তার পর আর ওকে কেউ ঘাঁটাতে সাহস করেনি।

মা শুধু কপালে করাঘাত হেনে কেঁদে বল্লেন—"আমার পোড়া কপাল।" ছেলে বল্লে—"তুমিত বৌ চেয়েছিলে পেয়েছ, আর আমাকে কেন!"

অর্দ্ধরাত্রে ঘরে ঢুকে ফুলসাজে শায়িতা স্বপ্নাহত', ভয়ত্রস্তা, আড়ষ্ট বধূ লতিকাকে নরেশ যে কথাগুলি শুনিয়ে দিলে তার থেকে লতিকা যে টুকু উদ্ধার করলে, সে শুধু এই যে নিজের প্রয়োজনে নরেশ ওকে আনেনি। ও শুধু ওকে বিয়ে করে পিতা মাতার 'ভদ্র লোকদের কথা দেওয়ার' সত্যবন্দিতার মর্য্যাদা রক্ষা করেছে। সুতরাং ওর সঙ্গে ওর কোন সম্পর্ক নেই।

তা' নেই হয়ত! অন্ততঃ কৈফিয়তের বালাই নেই; পুরুত, নাপিত, যে যার প্রাপ্য নিয়ে ঘরে যায়, পিতা মাতা অদৃষ্টের দোহাই পাড়েন, হোমের আগুন নিভেই যায়, আর

শালগ্রাম শিলা সিংহাসনে বসে ফুল পাতার পূজো পেয়ে খুসি হয়ে চেয়ে থাকেন।

সদ্য পিতৃ-গৃহ-আগতা লতিকা তখন পিতা, মাতা, ভাই, বোন, দিদি, দাদাদের স্মরণ করে চোখের জল ফেলছিল, তাড়া তাড়ি আড়ষ্ট হয়ে চোখ মুছে উঠে বসল।

নরেশ কিন্তু কোনদিকে অযথা চেয়ে দেখার কষ্ট স্বীকার না করে গট গট করে বেরিয়ে গেল।

প্রচণ্ড বিদ্রূপের মত সোজা সিঁথিতে সিন্দুরের রাঙা রেখা জ্বল জ্বল করে, হাতের সোনার চুড়ির সঙ্গে লোহার ঝঙ্কার যেন ঠাট্টা করে। পরম দুর্ভাগ্যের মত চরণে অলক্তক রেখা আঁকা পড়ে।

তা হোক এয়ো সংক্রান্তির দিন বাঙ্গা বৌ ওরই কপালে সিঁদুর ছুঁইয়ে ব্রতের ফল চায়। গায়ে হলুদে এয়োস্ত্রীদের মধ্যে ওর আমন্ত্রণ থাকে। বিধবা মণিমালা যেখানে মাথা নিচু করে বসে থাকে, ও সেখানে মাথা উঁচু করেই প্রবেশ করে। তরুণী সখীরা চিঠির ওপর বানান করে 'মিসেস্' লেখে, আগে ত লিখত না।

এক বাক্স জামা কাপড় ও পায়, অলঙ্কার ও চিঠি লেখবার গোলাপী খাম, নীল চিঠির কাগজ অবধি। আগে সখীদের চিঠি লিখতে হ'লে খাতার কাগজ টানতে হ'ত, এখন ঐতেই লেখে।

একাদশীর দিন মা বিশেষ করে ওর জন্যেই মাছ আনতে দেন।

কিন্তু আয়োজনটাই শুধু থাকে প্রয়োজন নয়। চুল বাঁধবার

সময় রোজই মায়ের চোখে জল আসে, মেয়ের শুভ্র সিঁথি খানি সিঁদুর দিয়ে দেগে দেবার দুঃখে হয়ত।

কিন্তু বলেন না সে কথা, পিসিমার দিকে চেয়ে কেঁদে বলেন "লতুর কপালে এও ছিল ভাই—"

সর্ষে পড়ায় ভূত ছাড়েনা, এ কেমন ভূত! শাশুড়ী সত্যবালা বধূর দিকে চান, তাতে হতাশার চেয়ে আদেশ ফোটে বেশী। অর্থাৎ সর্ষে পড়াত হ'ল, এবার বশীকরণ কবচটা ওকেই বার করতে হ'বে। বিয়ের মাস ছয়েক পরেই, শ্বশুরের চিঠি এল "বৌমাকে পাঠিয়ে দিন।" মা কেঁদে বল্লেন "আর কেন?—"

পিসিমাও কাঁদলেন কিন্তু রেগে রেগে।

বল্লেন—"বোর আমাদের এক কথা। আর কেন আবার কি? ও সব অলুক্ষুণে কথা শুনলে যেন গায়ে জ্বর আসে। পুরুষ অমন কত রাগ করে, তা'বলে কি আর মেয়ে মানুষের অমন ধারা মানায়! যা'-নয় তা-ই।

লতু আমার জন্ম এয়োস্ত্রী হ'য়ে ঐ ঘর করুক। স্বোয়ামী যেন 'নেব না' বলেছে, শ্বশুর ত ডেকেছেন! যাবে বইকি। এত আর মেম মাগীদের নিকে নয়, যে 'নেবে না' বল্লেই নেব না, ওসব ঠিক হয়ে যাবে।"

মা—চুপ করলেন। অকাট্য যুক্তি। অদৃষ্ট, মন্ত্রশক্তি, অনেক গুলোই ভিড় করে মনের মধ্যে পাদচারণ করছিল, তা ছাড়া বৌত ওদেরই। ওদের বাড়ীর ইঁট কাঠ গুলো অবধি লতুর ওপর বধূত্বের অধিকার জারি করতে পারে যে। 'নরেশ না নিল নেই নেই।' অবশ্য স্পষ্ট এমন কথাটা মনে না জাগলেও মনে হ'ল, 'শ্বশুর ত ডেকেছেন।'

দেবতাকে লোকে ভক্তি করে উল্টো দেবতাকে ভয় করতে হয়, ঘুসও দিতে হয়।

মা-ঘব বসতের জন্যে খাগড়াই বাসন আর ঘর জোড়া পালঙ্কের তালিকা নিয়ে বাপের ঘরে ঢুকলেন।

— ২ —

ঘর-বসতের আয়োজন চলে, খাট, পালঙ্ক, লেপ কম্বল। পিসিমার রসনাও চলে তালে, তালে, পা ফেলে; লতুর দুই কান, মগজ, উপদেশে ভরাট হয়ে ওঠে।

সীতা, সতী, সাবিত্রীর দৃষ্টান্ত পিসিমা লতুব সম্মুখেই তুলে ধরেন।

বলেন—'তুমি মা হিঁদুব ঘরের মেয়ে, সব সয়ে মুখটী বুজে থাকবে।

সাবিত্রী যমের মুখ থেকে স্বামী ফিরিয়ে এনেছিলেন, সে কথা কি কেউ ভুলতে পারে!'

লতু চুপ করে শোনে, 'হ্যাঁ' 'না' কিছুই বলে না।

ও প্রতিবাদ করে না, কিন্তু অনাবশ্যক একটা মনের বালাই অন্তরের কোন্ কোণ থেকে মাথা নাড়ে।

সেখানে ও বরণীয়া হ'য়ে যায়নি, যাবে না, কথাটা মনে হ'লেই একান্ত অ সাবিত্রীসুলভ ভাবে অন্তরবাসিনী নারী বিতৃষ্ণায় বিমুখ হ'য়ে ওঠে।

ভিক্ষার ঝুলি ওর কাঁধে ওঠে, কিন্তু মন মুখ ফিরিয়ে নেয়। বিছানায় শুয়ে শুয়ে লতুর ঘুম আসে না, খোলা জানালার ফাঁকে

ফাঁকে কতদূর আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে একটা তারা ক্রমাগত দপ দপ করে, একবার উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে ওঠে, একবার নিশ্চিহ্নপ্রায় হ'য়ে নিভে যায়। ক্ষুব্ধ হৃদয় মুগ্ধ হয়ে চায়, অপরূপ, অপরূপ, অপরূপ! দুরন্ত বাতাসের ছুটো-ছুটির শব্দ আসে, শাখায়, পল্লবে, নদীর তীরে তীরে, কত স্তব্ধ অরণ্যানীকে চরণ নূপুরের মৃদু গুঞ্জনে চকিত করে সে ছুটে আসে কে জানে! তার পথ-উতলা উত্তরীয়ের ক্ষণস্পর্শ জানালার ফাঁকে ফাঁকে লতুর ললাট ছুঁয়ে যায়। হয়ত লতুর ভাগ্য-বিধাতা সৃজন ভুলের বেদনায় ওকে সান্ত্বনা দেন না পরশ করে যান।

ওর অপমানিত নারীত্ব বেদনায় গুমরে কাঁদেনা, স্তব্ধ হ'য়ে যায়। বারি নেই, জ্বালা আছে শুধু!

নরেশের অনাবশ্যক চপলতা ওর অন্তরের বহু দিনের ধ্যান-স্তব্ধ প্রিয় মূর্ত্তির কল্পনাকে শুধু আহত করেনি কালি ছিটিয়ে কুৎসিৎ করেছে। পিসিমার উপদেশ ওতে কাজ করেনা, ও বুঝি অদ্ভুত!

মা উঠে এলেন—"ঘুমুলি নি?"

"ঘুম আসছেনা মা" লতু বল্লে। মা আস্তে আস্তে শিয়রেব পাশে বসে ওর মাথায় হাত দিলেন, কন্যা-বিরহ-শঙ্কিতা মেনকার মত ওঁর মনে আনন্দ-বেদনার আলো-ছায়া জাগলনা, শুধু নিঃশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস বুকে জেগে উঠল।

ঠাকুরের কাছে উনি মিনতি জানালেন লতু যেন মানুষের কাছে ঠাঁই পায়। লতু কিন্তু ঠিক সেই সময় কথা কইলে, বল্লে 'মা আমি যাব না।' মা শিউরে উঠলেন, বল্লেন "ষাট, যাবে

বই কি মা, জন্ম জন্ম সেই ঘর করবে।” একটু খানি ইতস্তত ভাব সহজেই মনে জাগল, তবু জোর করে সেটা কাটিয়ে বল্লেন “আসবার দিন জামাই কিছু বলেন নি?”

লতু সোজা হ’য়ে শুয়ে বাঁ-হাতটা আড় ভাবে চোখের ওপর চাপা দিয়েছিল, প্রশ্নের উত্তর দিলে না। মা আবার প্রশ্ন করলেন।

এই বার লতু হাতটা সরিয়ে কি এক রকম অদ্ভুত ভাবে মায়ের দিকে চাইলে।

মা থমকে গেলেন।

অনেক গুলো প্রশ্ন পর পর মনে জেগেছিল, ঠোঁটে এল না।

বাপ ছুটির দরখাস্ত করেছিলেন, মেয়েকে শ্বশুর বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসবেন, ছুটী পেলেন।

পিসিমা নিঃশ্বাস নিয়ে বল্লেন “ওসব ঠিক হ’য়ে যাবে। যাক্ এখন ভালয় ভালয় পৌঁছে দিয়ে আসুক। ওরে কানাই ভট্‌চায মশায়কে শুধিয়ে আসিস ত পরশু কটায় যাত্রা?”

লতু ভাঁড়ার ঘরের সম্মুখে বসে, আলুর খোসা ছাড়াচ্ছিল, অন্যমনস্ক ভাবে একবার পিসিমার মুখের দিকে চাইলে।

পিসিমার ঠোঁটেব আগায় সীতা সাবিত্রীর নাম কীর্ত্তন ভিড় করে এসেছিল, কিন্তু মেধো চাকরের বাজার আনার সশব্দ ঘোষণায় বেরিয়ে গেলেন।

লেখিকা—শ্রী প্রভাবতী দেবী গঙ্গোপাধ্যায়

— ৩ —

শিয়ালদা ষ্টেশনে ট্রেণ থাম্‌তেই সুরেশ এগিয়ে এসে কেদার বাবুর পায়ের ধূলো নিল। তার মাথায় হাত রেখে মনে মনে আশীর্ব্বাদ ক'রে কেদার বাবু বল্লেন, "এইযে বাবা সুরেশ, এসেছো ? খপর ভালতো সব ? বাবা মা—"

সুরেশ সহাস্যে বোল্লে, "আজ্ঞে হ্যা, সব ভাল। বৌদি ? বৌদি কই ?"

"এই পাশেই মেয়ে গাড়ীতে। তুমি নাবিয়ে আনো বাবা। আমি ততক্ষণ জিনিষ-পত্তবগুলো—এই কুলি, কুলি। হাঁ হাঁ জল্‌দি আওনা বাপু।"

মেয়ে গাড়ীর কাছে এসে দাঁড়াতেই লতিকা ধীরে ধীরে নেমে এলো। সুরেশ হাসিমুখে বোল্লে, "বেশ ভাল আছ বৌদি ? আমার চিঠি পেয়েছিলেতো ?"

লতিকা হাসিমুখে ঘাড় নেড়ে জানালো, 'হ্যা'।

সুরেশ প্রাণাম করবার জন্য নত হোয়ে হাত বাড়াতে লতিকা বাধা দিল। চট ক'রে একটু সরে গিয়ে সসব্যস্তে ব'লে উঠলো, 'ওকি ! না-না ছিঃ ! ঠাকুরপো !"

সুরেশ থম্‌কে প্রশ্ন ক'র্‌লো "কেন ?"

"আপনি যে আমার চেয়ে ক'মাসের বড় ভাই।"

"তাতে কি হোলো, তুমি যে আমার বৌদি পূজনীয়া—"

লতিকা হেসে বোল্লে, "তা হোক্‌, তবু কেমন যেন বিশ্রী লাগে ঠাকুরপো।"

সুরেশ সহাস্যে জবাব দিলে, "আচ্ছা, প্রণাম তাহ'লে কোর্‌বোনা আর—যদি মনে থাকে। নমস্কার!"

লতিকা হেসে হাতদুটী জোর ক'রে কপালের কাছে তুলে ধ'রলো।

কেদার বাবুর সচঞ্চল দৃষ্টি সেই অপার জনস্রোতের মাঝে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল, যেন কাউকে তিনি খুঁজছিলেন। তাদের এগিয়ে নেবার জন্য ষ্টেশনে সুরেশ এসেছে দেখে তার মনটা খুসী হয়েছে সত্য, কিন্তু যাকে আস্‌বার জন্য তিনি বার বার লিখেছিলেন, বোধকরি কন্যা লতিকাও লিখেছিল, স্ত্রী রাজলক্ষ্মীও লিখতে ভোলেন নি—তাকে সুরেশের সাথে দেখতে না পেয়ে মনটা তাঁর কেমন যেন ভারী ঠেক্‌তে লাগলো।

চিরটা কাল সংসারের ক্ষুদ্র দলাদলি, ঝগড়া-ঝাঁটি, মন কষাকষি, হিসাব-নিকাশ, কর্ম্ম কোলাহলের বাইরে তিনি কাটিয়ে এসেছেন। মাস কাবারে মাইনের দেড়শোটি টাকা স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে তিনি একেবারে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বাইরের ঘরে সমবয়স্কদের সাথে পাশা-খেলায় নিজেকে বিলিয়ে দিতেন। কি ক'রে যে সংসারটা চ'ল্‌তো, ছেলেদুটীর কলেজের মাইনে, ঝি-চাকরের মাইনে জোগাড় হোতো, পূজা পার্ব্বন, দান ধ্যান প্রভৃতি হিন্দুর প্রত্যেকটী ক্রিয়া-কলাপ আচার-ব্যবহার পালিত হোতো, বিধবা ভগ্নীর হবিষ্যির পৃথক আয়োজন হোতো—সে সবের খোঁজ খবর নেবার কোন প্রয়োজনই তিনি অনুভব কোত্তেন না; কিন্তু বিস্মিত হোতেন তখন, যখন দেখতে পেতেন, সমস্ত খরচ কুলিয়েও মাসের শেষে ঘরের লক্ষ্মী রাজলক্ষ্মী

গোটা পাঁচ-সাত টাকা এনে তাঁর হাতে দিতেন ব্যাঙ্কে রেখে দেবার জন্য।

হয়তো কোনদিন সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস কোত্তেন, "এতদিকের এত খরচ মিটিয়েও আবাব উদ্বৃত্ত থাকে কি করে?"

রাজলক্ষ্মী হেসে জবাব দিতেন, "আমি যে টাকা তৈরী করা আরম্ভ কোরেছি গো, জাননা বুঝি"? তারপর তেমনি হাস্‌তে হাসতে বোল্‌তেন, "সে খোঁজে তোমাব কি দবকাব? তার চেয়ে যা বলি শোনো, জামাটা গায়ে দিয়ে চট্ ক'রে বেরিয়ে পড় দেখি, অফিস যাবাব পথে পোষ্টাপিসে টাকা কটা রেখে দিতে ভুলনা—এই নাও পাশ বই। দশটা যে প্রায় বাজলো, সে হুঁস আছে? না তামাকের ধোঁয়ায়..."

কেদারবাবু জানতেন, মেয়ে সুন্দবী হোলেই আজকাল বিয়ে দেয়াটা নিতান্ত সহজ হ'য়ে পড়ে না। গান বাজনা, লেখাপড়া, সেলাই ফোঁড়, সাজ-গোজ এসব না জান্‌লে ক'নে পছন্দের বাজারে ভাবী মুস্কিলে প'ড়ে যেতে হয়। কিন্তু মেয়েকে স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দেবার মত সামর্থ্য কোথায় তার? এই সামান্য আয়ে কি আরো একজনের স্কুলের মাইনে জোগানো সম্ভব হয়।......রাজলক্ষ্মীকে বোল্‌তেই তিনি বোলে উঠলেন, হ্যাঁগো—সত্যি, ভাল কথাটা মনে করেছ কিন্তু! আমি বোল্‌বো বোল্‌বো ভাবি, আর রোজই ভুলে যাই, যে ছাই মন আমার।—এক কাজ ক'র্‌তো তুমি, কানাই ভট্‌চাজ মশাইকে দিয়ে একটা ভাল দিন দেখিয়ে এসোতো, মতুকে ভর্ত্তি ক'রে দাও।"

শুক্‌নো মুখে কেদারবাবু জিজ্ঞেস কোল্লেন, "কিন্তু টাকা কোথায় লক্ষ্মী ?"

"আবার !—টাকার খোঁজে তোমার কি দরকার ? তুমি যাও দেখি।" বোলেই কি একটা কাজে তিনি রান্না ঘরের দিকে চ'লে গেলেন।

লতিকাকে স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দেয়া হোলো। বছরের পর বছর কেটে যেতে লাগলো। লেখা পড়ায় ধাপে ধাপে ওপরে ওঠবার সাথে সাথে বয়সও তার ধাপে ধাপে বেড়ে উঠলো। ষোলটী বসন্তের মাধুরিমা তার অঙ্গে অঙ্গে মুঞ্জরিত হোয়ে উঠলো। রাজলক্ষ্মী নিজেই উদ্‌যোগী হ'য়ে তার বিয়ের জন্য ঘট্‌কী লাগালেন। নগদ পণ, অলঙ্কার, যৌতুকাদির বিরাট ব্যয়বাহুল্য ও সেই অনুপাতে নিজের অর্থাভাবের কথা মনে জাগলেও কেদারবাবু গৃহিণীর অসামান্য বুদ্ধি ও অত্যদ্ভুত কর্ম্ম-কুশলতার ওপোর নির্ভর ক'রে পরম নিশ্চিন্তে পাশা নিয়ে র'ইলেন।

বিয়ে স্থির হ'য়ে গেল। পাত্রের পিতা সহৃদয় ব্যক্তি; লতিকার লক্ষ্মীপ্রতিমার মত সুন্দর মুখখানি, হাতের চমৎকার রান্না, কোমল স্বভাব আর বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পেয়ে তিনি ভারী খুসি হোলেন এবং বিবাহে পুত্র ও পুত্রবধূর জন্য তিনি কিছুই দাবী কোত্তে চাইলেন না, সমস্তই কেদারবাবুর হাতে ছেড়ে দিয়ে তিনি সাগ্রহে লতিকাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে গেলেন।

অবশ্য কোন কিছু দাবী কর্‌বার প্রয়োজনও ছিলনা তার। কোলকাতার মত সহরে চার পাঁচখানা বাড়ী, দেশে বিস্তর

জমাজমি, ব্যাঙ্কে সঞ্চিত বিপুল অর্থ ছাড়াও তার মাসে মাসে পেন্‌সন বাবদ যা আস্‌তো, তা নিতান্ত কম নয়।

ছোট ছেলে সুরেশ কলেজে আই, এ প'ড়ছিল। বড় ছেলে নরেশ এম্‌-এ বি-এল পাশ ক'রে দেশের কাজে মেতে উঠেছিল। তিনি নিজে গভর্ণমেণ্টের পেন্‌সন্‌ ভোগী হ'লেও খুব বেশী কিছু আপত্তির কারণ দেখতে পান্‌নি, বা পুত্রের স্বাধীন চিত্তকে আঘাত কর্‌বার কোন অসঙ্গত প্রয়োজন অনুভব করেন নি। কিন্তু গৃহিণী সত্যবালা ছন্নছাড়া পুত্রের সংসারে বীতস্পৃহা এবং ঘর ছেড়ে পরের জন্য অস্বাভাবিক আগ্রহ ভাল চোখে দেখলেন না। স্বামীর সাথে পরামর্শ করে তিনি বন্য শার্দ্দুলকে ঘরের মাঝে বন্দী কর্‌বার জন্য এক অপূর্ব্ব স্বর্ণ-নিগড় আবিষ্কার ক'রে ফেল্‌লেন। কাজেই স্বামী যখন দেনা-পাওনা বোঝা-পড়ার চাইতে নূতন কুটুম্বের সাথে সখ্যতা ও প্রীতি স্থাপনা কর্‌বার বাসনাটাই বেশী করে ব্যক্ত ক'রে ঘরে ফির্‌লেন, তখন সত্যবালা বিশেষ মনক্ষুণ্ণা হননি এই ভেবে যে লতিকা অসামান্যা সুন্দরী।

কেদারবাবু কিন্তু স্তব্ধ হ'য়ে গেলেন। এত বড়লোক, অগাধ ঐশ্বর্য্য, মান সম্মান···অথচ অন্তরে তার অহঙ্কারের লেশ মাত্রও নেই···সরল, অমায়িক হৃদয় সর্ব্বদাই যেন নিজেকে ছোট ক'রে সবার কাছে বড় হ'য়ে আছেন তিনি···

বৈবাহিক কোন কিছুর দাবী না কোল্লেও কেদারবাবু কার্পণ্য করেন নি। স্ত্রী রাজলক্ষ্মীর নিপুণতায় তার সারা জীবনে যা কিছু সঞ্চিত হোয়েছিল সমস্তই তিনি কন্যার বিবাহে ব্যয় ক'রে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্লেন, যেন তার অর্থের সার্থকতা শুধু এই প্রয়োজনটুকুর ভেতরেই ছিল।···

কিন্তু বিবাহের পরে কন্যা লতিকার ব্যথা-মলিন মুখখানি, তার বেদনাহত ভাবান্তর কেদারবাবুর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। ভেতরের কোন খবরা-খবর না রাখলেও এটা তিনি সঠিক আবিষ্কার ক'রে ফেল্লেন যে নরেশ ও লতিকার বিয়ে সুখের হয় নি। এ চিন্তাটা তার বুকে ঠিক তপ্ত শেলের মতই বিঁধলো। কিন্ত কোথায় যে কি ঘটেছে, কেমন করে যে এমনটা হোলো, কেন যে নরেশ লতিকার মত লক্ষ্মী মেয়ের প্রতি বিরূপ, তাদের মনোমালিন্যের গোপন ক্ষতটা যে কোন আড়ালে লুকিয়ে থেকে কালকূট ছড়াচ্ছিল—তা অনুসন্ধান ক'রে দেখবার মত মানসিক বৃত্তি তাঁর ছিলনা, তাই অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে তিনি নীরব হ'য়ে র'ইলেন।

কিন্তু বারবার ক'রে লেখা সত্বেও নরেশ ষ্টেশনে আসেনি দেখে তার মনের সেই পুরোণো কাঁটাটা যেন আজ আবার নূতন ক'রে খচ্‌খচ্‌ ক'রে উঠলো। কন্যার পানে একবার চেয়ে দেখলেন; যদিও সে বেশ হেসে হেসেই সুরেশের সাথে কথা কইছিলো, তবুও তার চোখে মুখে অন্তরের অব্যক্ত বেদনার স্পষ্ট ছাপ তাঁর কাছে ধরা প'ড়ে গেল।

এমনি দুঃসহ জ্বালায় যখন হৃদয় তার বিদগ্ধ হোচ্ছিল, নিদারুণ মনস্তাপে চোখে জল আস্‌ছিল, জিজ্ঞেস করি করি কোরেও একটু ইতস্ততঃ কোরছিলেন—তখন তাঁর সকল চিন্তা, সকল ভাবনা দূর ক'রে দিয়ে সুরেশ সহসা বোলে উঠলো,—"দেখলে বৌদি, দাদার কাণ্ডখানা। আমায় ষ্টেশনে আস্‌তে বোলে সেই যে বিকেল বেলা কোথায় বেরুলেন, আর তার দেখাই নেই! আমি বার বার বোল্লুম ষ্টেশনে আস্‌তে;

বোল্লেন হ্যাঁ—হ্যাঁ, সে জানি আমি। তুই যা-না? আমায় ট্রেণ পৌঁছবার ঠিক্ মিনিট খানেক আগে ষ্টেশনে পাবি, যা।—কিন্তু কোথায়? এখন অবধি তার দেখাটি নেই!"

লতিকা কথা কইলো না, শুধু একটুখানি ম্লান জোছনা তার রাঙ্গা রাঙ্গা ঠোঁটদুটীর ফাঁকে ফুটে উঠে আবার নিমেষে মিলিয়ে গেল। কেদারবাবুও নীরব রইলেন। একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে মাথার ওপরকার ঘড়িটার দিকে খানিকক্ষণ অর্থ-শূন্য চোখে চেয়ে রাইলেন। তারপর একটা হাই তুলে বোল্লেন, "চল সুরেশ, ভীড়টা এবার কমেছে।"

বাইরে সুরেশদের মোটর দাঁড়িয়েছিল। সোফার দরজা খুলে দিতেই সুরেশ বোল্লে, "উঠে পড় বৌদি, আমি জিনিষ-পত্তরগুলো তোল্‌বার ব্যবস্থা করি।" তারপর কেদারবাবুর দিকে চেয়ে বোল্লে, "আপনি বসুন বৌদিকে নিয়ে।" লতিকা ধীরে ধীরে ভেতরে ঢুকে বোস্‌লো।

এমন সময় সহসা নরেশ এসে উপস্থিত। পায়ে স্যাণ্ডেল, পরণে খদ্দরের কাপড়, পাঞ্জাবি, চাদর, চুলগুলো উস্কো-খুস্‌কো অনাদৃত, চশমার কাঁচে ধুলো জমেছে—দেখলে মনে হয় যেন নিজেকে এতটুকু যত্ন ক'রবার মত সময়ও তার নেই?… তাড়াতাড়ি সাইকেলটা মোটরের গায়ে দাঁড় করিয়ে রেখে কেদারবাবুকে প্রণাম কোরে নরেশ বোল্লে, "আমার আস্‌তে একটু দেরি হ'য়ে গেছে। একটী ভদ্রলোকের সাথে কথা কইছিলুম, সেখান থেকে আর তাড়াতাড়ি উঠতে পারলুম না। কোন কিছু অসুবিধে হয় নি তো আপনাদের?"

কেদারবাবু তার মাথায় হাত দিয়ে সস্নেহে বোল্লেন, "না

কোন অসুবিধেই হয়নি—সুরেশ ছিল, তুমি ভাল আছ তো ?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ,” তারপর সুরেশের পানে মুখ ফিবিয়ে বোল্লে, “সুরেশ, আর দেরি ক'রে লাভ কি ? এদেব নিয়ে যা তুই। ঠাকুরকে বলিস্ আমার খাবার চাপা দিয়ে রাখ্তে। হয়তো আমার ফির্তে দেরি হোতেও পারে”। •

কেদারবাবু জিজ্ঞেস্ কোল্লেন, “কেন তোমার কি কোন কাজ আছে বাবা ?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ।”

কেদাববাবুব মনে অনেক প্রশ্নই ক্রমাগত ভীড় কোরে আস্‌ছিল, কিন্তু সে সবগুলো প্রকাশ করাটা ন্যায়সঙ্গত বোধ হোলোনা। শুধু বোল্লেন, “তাহ'লে এসো বাবা। কিন্তু এই রাত্তির কোরে কোল্‌কাতাব বাস্তায় একটু সাবধানে সাইকেল চালিও যেন।—আব বেশী রাত কোবোনা অনর্থক, তাহলে চিন্তায় থাক্‌বো আমরা সবাই।”

নরেশ যেম্‌নি তাড়াতাড়ি এসেছিল, তেম্‌নি তাড়াতাড়ি সাইকেলে চ'ড়ে অদৃশ্য হ'য়ে গেল, যাবার মুখে মুখ ফেরাতেই নিমিষের জন্য মোটরের ভেতরে লতিকার চোখে চোখ প'রে গেল। লতিকার পরম আগ্রহ-ভরা ডাগর ডাগর কালো চোখদুটীর কোলে একখানা সাধ আকাঙ্ক্ষাময় প্রেমিকা নারী প্রকৃতির প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছিল কিনা তা উপলব্ধি ক'রে দেখবার কোন প্রয়োজনই সে অনুভব কোরলে না, সে অবসরও তার ছিলনা বোধ করি। লতিকাও নরেশের ক্ষণ-দৃষ্টিতে.

এমন কিছুই দেখতে পেলেনা যাতে করে নিজের অশান্ত মনটাকে প্রবোধ দেয়া চল্‌তে পারে।

কেদার বাবু একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে মোটরে উঠে বস্‌লেন। শান্ত মধুর শরতের সন্ধ্যায় আলোকিত রাজপথে ঝির ঝিরে মিঠে হাওয়ায় অন্যমনস্ক ভাবে মোটরে বসে যেমন তিনি একটুও আনন্দ পেলেন না, তেমনি জান্‌তেও পাল্লেন না যে তাঁবই পাশে বোসে একজন শাড়ীর প্রান্তে বার বার তার অবাধ্য অশ্রুকণা মোচন কোরছিল।

— ৪ —

বাইরের ঘরে শৈলেশ্বর বাবু বন্ধু-বান্ধবদের সাথে গল্পগুজব কোরছিলেন, কেদারবাবুকে দেখে একেবারে কলরব কোরে উঠলেন "এই যে কেদার বাবু, আসুন আসুন নমস্কার। আরে মশাই, আপনাব প্রতীক্ষায় আমরা সেই তখন থেকে ব'সে আছি। পথে কষ্ট হয়নিতো কোন? তারপর কেমন আছেন বলুন, খপব ভালতো সব? এব কথাই আপনাদের বোল্‌ছিলুম বীরেনবাবু, ইনিই আমার বেই, নরেশের শ্বশুর। ভারী চমৎকার লোক, ধর্ম্মভীরু, অমায়িক, সাধু—আরে না না তাকি হয়? ওখানে কেন, এইটেতেই বসুন না।" বোলে তিনি নিজেই কেদারবাবুর হাত ধ'রে গদি আঁটা চেয়ারটায় বসিয়ে দিলেন। তারপর ভৃত্যের উদ্দেশে বোল্লেন, "ওরে কে আছিস্? কেদারবাবুকে তামাক দিয়ে যা শীগ্‌গির। দিন্, লাঠিটা আমার কাছেই দিন।" বলে হাত থেকে লাঠিটা একরকম টেনে নিয়েই ব্রাকেটে ঝুলিয়ে রাখলেন।

কেদারবাবু কি কোরবেন স্থির কোত্তে পাল্লেন না। বৈবাহিকের সরল অমায়িক ব্যবহার, তাঁর অহঙ্কারের লেশমাত্রহীন আচরণ, তাঁব সুমিষ্ট সম্বোধনের প্রত্যুত্তবে কি বোল্লে বা কি কোল্লে যে ঠিক মানানসই হবে তা তিনি সহসা বুঝে উঠতে পাল্লেন না। তিনি মুগ্ধ হ'লেন, শ্রদ্ধায় তাঁর হৃদয়খানা কানায় কানায় ভরপুর হোয়ে উঠলো। এঁর বিবাট আন্তবিকতার কাছে নিজেকে যেন অত্যন্ত ছোট বোলে মনে হ'তে লাগলো। ক' মুহূর্ত্ত চুপ কোবে থেকে তিনি ভাবরুদ্ধ কণ্ঠে প্রতিনমস্কার জানালেন।......

অন্দবে শাশুড়ী সত্যবালাও সস্নেহে পুত্রবধূর চিবুক স্পর্শ ক'রে প্রশ্ন কোল্লেন, "এসো মা লক্ষ্মী এসো। তোমার মুখখানা অমন শুকিয়ে গেছে কেন মা? কোনো অসুখ বিসুখ কোরেছিল নাকি?"

লতিকা গড় কোরে হেঁটমুখে জবাব দিলে, "না মা।"

"তবে? চেহারা একেবাবে আধখানা হোয়ে গেছে যে!"

লতিকা কি জবাব দেবে এর? অসুখটা যে তার দেহের নয় মনেব, তার তৃষিত অন্তরাত্মা যে এক কণা অমিয়ার আশায় ভেতরে ভেতরে মাথা খুঁড়ে মবছিলো তা কি সব্বার কাছেই বলা চলে?... ...সে নীচু মাথা তার আরও নীচু ক'রে নীরব হোয়ে র'ইলো।

এ প্রশ্নের উত্তর সত্যবালার মনেও বিলক্ষণ জাগছিলো। কেন যে লতিকার এ শান্ত সমাহিত ভাব তা তিনি ভালো কোরেই জানতেন। তবু আজ পুত্রবধূর এই নীরবতাটুকু যেন মুখর হোয়ে উঠে তাকে অনেক কথা নূতন কোরে স্মরণ

করিয়ে দিলো। কিন্তু সত্যি বিস্মিতা হোতেন তিনি, যখন দেখ্‌তে পেতেন এই অফুরন্ত সৌন্দর্য্যের সম্ভার, এই শিউলি-বকুলের মোহনমালা হেলায় ঠেলে ফেলে পুত্র তার কেমন কোরে দূরে দূরে থাক্‌তো!……ওই ভাসা ভাসা কালো চোখদুটী, ওই পাত্‌লা রাঙ্গা রাঙ্গা ঠোঁট দুখানি, আষাঢ়ের ধূমল মেঘের মত ওই লতিয়ে পড়া চুলের গোছা, দুধে আল্‌তায় মেশানো ওই টুক্‌টুকে গায়ের রংটী, ওই সুগোল ও সুগঠিত দেহবল্লরীব পানে চাইলে বুঝি মুনিরও চিত্ত বিভ্রম হয়! আব পুত্র তার কি কোবে যে…স্নেহান্ধ হৃদয় তার পুত্রকে এজন্য দোষী না কোরে মাঝে মাঝে দোষী কোর্‌তো ওই লতিকাকেই! মনে হোতো হয়তো সেই বাসন্তী সুষমাব মাঝে এমন কোন অভাব ত্রুটী লুকিয়ে ছিল, যাতে কোরে নরেশকে সম্মোহিত করার পথে দুস্তর বাধার প্রাচীর সৃষ্টি হোয়েছিল। তাই মাঝে মাঝে তিনি লতিকার অসাফল্যে বিরক্ত হোয়ে উঠ্‌তেন।

কিন্তু পরক্ষণেই সন্দেহের দোলায় মনটা কেমন দুলে উঠ্‌তো। ঝির কাছে পুঙ্খানুপুঙ্খ খবব নিয়ে এবং নিজেও সতর্ক দৃষ্টি বেখে দেখতে পেতেন, নরেশ লতিকাকে তেমন আদর না করুক, অনাদর তো করেনা! প্রায়ই অনেক রাত্তিরে নরেশ বাড়ী ফেরে বটে, কিন্তু এসেই চুপটী কোরে শুয়ে পড়েনা তো! দুজনের অস্ফুট গল্প-গুজব মাঝে মাঝে চ'লে বৈকি!—তবে?…

কে এর উত্তর দেবে? বাহ্যতঃ নারীর অটুট রূপ-যৌবন-সম্ভার, অফুরান্ প্রেমের ফল্গু, অগুণতি গুণাবলী, পুরুষের যা কিছু আদরণীয় সব থাকা সত্ত্বেও কেন যে সে স্বামীর মন জয়

কোরতে পারে না, এতটুকু কিসের ত্রুটী কোন আড়ালে লুকিয়ে থেকে যে তার মিলন-আশার মুখে ছাই ছড়িয়ে দিতে থাকে, তার যেমন কোন সঠিক জবাব পাওয়া যায় না, তেমনি স্বামীর আদর-সোহাগ-ভালবাসা পেয়েও কখনো কখনো নারীর মন কেন মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে আপনি ক্ষত বিক্ষত হয়, কেন সে আপনার চারিদিকে দৈন্যের প্রাচীর গ'ড়ে তোলে, কেন তার অন্তরের অন্তরতমে একটী কুশাঙ্কুর অহর্নিশি বিঁধ্‌তে থাকে—প্রশ্ন কোরেও কি এর সঠিক উত্তর পাওয়া যায়?

সত্যবালা যে একেবারেই কিছু বুঝতেন না তা নয়; কিন্তু বুঝলেও কোন প্রতিকার ক'র্‌বার উপায় ছিল কি? দেহের রোগের ওষুধ সহজলভ্য হোতে পারে কিন্তু মনের রোগের ওষুধতো তা নয়! তবু লতিকাকে পরিপাটি করে চুল বেঁধে সাজিয়ে গুজিয়ে দেয়া থেকে আরম্ভ কোরে সকাল সকাল খাইয়ে ঘরে পাঠিয়ে দেয়া অবধি প্রত্যেকটি খুঁটি-নাটির দিকে সজাগ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল তার। মাঝে মাঝে পুত্রবধূকে সময়োচিত উপদেশও তিনি যথাসাধ্য ইঙ্গিতে জানিয়ে দিতে কার্পণ্য কোরতেন না।

হয়তো কোনদিন লতিকার পানে চেয়ে বোল্‌তেন "ওকি বৌমা, ও কাপড় পর্‌তে কে বোল্লে তোমায়?"

লতিকা বোল্‌তো, "আমি নিজেই পরেছি মা।"

"কেন? আমিত তোমায় বার বার মানা কোরেছি বাছা, ময়লা কাপড় পোরোনা!"

লতিকা হয়তো নিজের দেহের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে শান্তস্বরে জবাব দিতো, "কই, তেমন ময়লাতো হয়নি মা, সবে পরশু বাক্স থেকে বার করেছি।"

"তা হোক বাছা, ওটা বদলে ফেল। বাক্স থেকে একখানা রঙ্গীন শাড়ী বার করে পরগে সেই বাসন্তী রঙ খানা। উনিও বলেন রঙ্গীন শাড়ীতে বৌমাকে আমার ঠিক যেন লক্ষ্মী-ঠাকরুণটীর মত দেখায়।"

এমনি কোরে সাজিয়ে গুজিয়ে এতটুকু ত্রুটি না রেখে সত্যবালা তাকে নরেশের সমুখে নানা অছিলায় পাঠিয়ে দিতেন। কিন্তু হিমালয়কে কি টলানো যায়? লক্ষ ঝঞ্ঝাব উন্মত্ত দাপট তার পাষাণ বুকে প্রতিহত হ'য়ে অস্ফুট রোদনে ফিরে আসে।...

সত্যবালাব অব্যর্থ টোট্‌কাগুলো যতই ব্যর্থ হোয়ে ফিরে আসতে লাগলো, ততই তিনি আরো বেশী ক'রে দায়ী কোত্তে লাগলেন পুত্রবধূকে। তাঁর ক্রমে স্থির বিশ্বাস জন্মে গেল লতিকার মত অপরূপ রূপসী মেয়ে যদি স্বামী বশ করবার একটু আধটু কায়দা কানুনও জান্‌তো, তবে ছেলে তার স্বদেশী নিয়ে এমন দিনরাত লক্ষ্মীছাড়ার মত ঘুরে বেড়াতোনা ...এই এতদিনে নিশ্চয়ই একেবারে বদ্‌লে যেতো। বাইরে যাবার সময় হয়তো লতিকার সাথে দেখা না কোরেই গট্‌ গট্‌ কোরে বেরিয়ে যেতনা, গিয়েও তার চাঁদমুখানির ছবি ভুল্‌তে পারতোনা এক মুহূর্ত্তও—আর সেজন্যই হয়তো এমনি অবেলায় না ফিরে সকাল সকাল বাড়ী ফিরতেই হোতো তাকে।...

কিন্তু সর্ষেকেই যদি ভূতে পায়, তবে তা-দিয়ে ভূত ছাড়ানো যায় কি? সত্যবালার সোনার শেকল নরেশকে জড়াতে গিয়ে যে মাঝে মাঝে নিজেই জড়িয়ে পড়বার উপক্রম কোরতো, তা হয়তো তিনি বুঝতে পারেন নি।

পুরুষদের খাওয়া শেষ হবামাত্রই সত্যবালা লতিকাকে

খাইয়ে ছেলেব ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। বোলে দিলেন, "এখনি গিয়ে যেন শুয়ে পোড়োনা বৌমা। বাড়ী ছেড়ে এসেছ, তোমার পিসিমা, মা হয়তো কত চিন্তা ভাবনা কোরছেন, তাদের এক একখানা চিঠি লিখে রাখগে যাও। আর নরেশের টেবিলটা একটু সাজিয়ে গুছিয়ে রেখোত মা। এমনি অগোছালো স্বভাব ওব যে কোথায় কি' কখন ফেলে রাখে, দরকারের সময় একটাও খুঁজে পায়না, আর না পেলেই অম্‌নি বাড়ীশুদ্ধ তোলপাড কোবে তোলে। আর কাল্‌কে ডাইং-ক্লিনিংএ কি কি দিতে হবে এক জায়গায় কোরে রোখো যেন, বুঝলে?"

লতিকা ঘাড় নেড়ে সায় দিল, বুঝেছে।

এমনি অনেক কাজের ভার তিনি দেন।

কেন দেন নবেশের বেশী রাত্তিবে ফেবার সাথে এর সম্পর্ক কি লতিকা তা মাঝে মাঝে বুঝতে পাবে বৈকি। ধীবে ধীরে সে ঘরে এসে প্রবেশ কোরলো।

চমৎকাব সুসজ্জিত ঘবখানি। ফিকে সবুজ রংয়ের দেয়ালে টাঙ্গানো সুদৃশ্য ফ্রেমে আঁটা ছবিগুলো, মাথাব ওপোব বৈদ্যুতিক পাখা, চোখ ঝল্‌সানো আলো, ফ্রেঞ্চ পালিশ কবা মেহগনি কাঠের টেবিল, গদীমোড়া চেয়ার, ধপধপে পুরু বিছানাপাতা সুদৃশ্য পালঙ্ক সব মিলে কি যেন এক অননুভূত পুলক লতিকার শিরায় শিরায় বন্যা ছুটিয়ে দিল।—ঐতো টেবিলের ওপোর নরেশের একখানা ফোটো...কি চওড়া বলিষ্ঠ বুকখানা. কি আয়ত উজ্জল নয়ন দুটী...ভোরের আলোয় ফোটা বেল ফুলটীর মত কি শুভ্র সুন্দর মুখখানা...হাতদুটী সংবদ্ধ ক'রে বুকের

ওপোর রেখে মুখ ফিরিয়ে যেন সে তার পানে চেয়েই মৃদু মৃদু হাস্‌ছে !···ঐ বুকে মাথা রেখে, ঐ মুখের কাছে মুখ নিয়ে, ঐ হাসিমাখা ঠোঁট দুখানিতে...মুহূর্ত্তের জন্য লতিকার মনে হোলো বুঝি তার মত সুখী এ দুনিয়ায় আর কেউ নেই !···

ধীরে ধীরে পূব দিকের জানালাটা লতিকা খুলে দিলো। গলির ওপাশেই একখানা বাড়ীব জানালা খোলা, পর্দ্দা নেই... ভেতরের সবই দেখা যায়, সব কথাই শুন্‌তে পাওয়া যায়।

একটী তরুণী ছোট্ট খোকাটিকে দুধ খাওয়াচ্ছে। বাঁ হাতখানা কাঁধের নীচে দিয়ে কোলের ওপোর শু'য়ে বাটি থেকে ঝিনুক কোরে দুধ তুলতেই সে লাথি মেরে সবখানি দুধ ফেলে দিল ও সবেবে চীৎকার জুড়ে দিল...কি যেন ঠিক মন মত হয়নি তার। তরুণী তাকে শান্ত কর্‌বাব জন্য কত কথাই বোল্‌তে লাগ্‌লেন "—ও, ও, ও, না, না, কি হোয়েছে, কে মেরেছে—ষাট্‌ ষাট্‌—ঐ ঐ যে পুষি।—আয় পুষি, আয়, আয়,—ঐ ভাখ্‌, ওটা কিরে ঐ ধরলো—চুপ্‌ চুপ্‌, যা পুষিকে সব দুধ দিয়ে দি, নেরে পুষি, দুধ নে, খোকা খাবেনা—আয় আয় তু—তু, তোরে দোবো দু—দু।"

খোকা তবু থাম্‌লো না, বরং চীৎকার তার আরো উর্দ্ধে উঠলো। মা তাড়াতাড়ি উঠে তাকে নিয়ে ঘু'রে বেড়াতে লাগলেন। তারপর টেবিলের সাম্‌নে এসে বোল্‌তে লাগলেন, "এই ফাওন্‌টেন্‌টা নিবি ? এই নে। বাঃ বাঃ, এটা কিরে ?" বোলে ফুলদানী থেকে একটা গোলাপ তুলে তার হাতে দিলেন, খোকা চুপ কোর্‌লো। তারপর আবার তেমনি কোরে বোসে দুধ খাওয়াতে লাগলেন।

এমন সময় একটি সুশ্রী যুবক এসে ঘরে ঢুক্লেন—বোধহয় সেই তরুণীটীরই স্বামী। এসেই তিনি তরুণীর কোলে থেকে খোকাকে তুলে নিয়ে অজস্র চুমুতে তার কচি মুখখানা ভ'রে দিলেন। তরুণী চোখে হাসি মুখে রাগ নিয়ে বোলে উঠলেন "বাঃ, বেশ লোকতো তুমি! দুধ খাওয়াতে দেবেনা? আচ্ছা, এবার যদি খোকা কাঁদে, আমি আর 'পারবোনা খাওয়াতে। দেখি কে দুধ খাওয়ায়।"

তরুণ হাস্‌তে হাস্‌তে তার কোলে খোকাকে ফিরিয়ে দিয়ে মুখ নীচু কোরে খোকাকে আর একটা চুমু খেলেন। তারপর মুখ তুলে পত্নীব চোখের পানে এমনি ভাবে চেয়ে রইলেন, যে তার গোপন অভিসন্ধি বুঝতে পেরে হাসিমাখা কালো চোখদুটিতে ভ্রূকুটি কোরে তরুণী বোলে উঠলো, "যাও, ভালো হবেনা কিন্তু বোলছি। এখন জামা কাপড় ছেড়ে ফেলে লক্ষ্মীটীর মত দুটী খাওগে যাও, ঐযে ঢাকা রোয়েছে। সেই কোন সকালে খেয়ে গ্যাছো মনে পড়ে?"

তরুণ হেসে জবাব দিলেন, "তা পড়ে বৈকি। কিন্তু তুমি বুঝি ভাবো অফিসে বোসে শুধু খাবার চিন্তাই করি? তা হলেতো গেছি আর কি! যে সাহেব! যেন বুলডগ!"

তরুণী বোল্লে "কিন্তু এটাতো আর অফিস নয় মশাই—নিজের বাড়ী। এখানে কলমও পিষতে হয়না বা বড়সাহেবও নেই। কাজেই—"

তরুণ মাথা নেড়ে বোল্লেন, "তা ঠিক্। বড়সাহেব নেই বটে, কিন্তু তার সাক্ষাৎ ঠান্‌দিটী রোয়েছেন! ইংরেজী বুকুনি না ছাড়লেও মাঝে মাঝে বাংলা বাক্যবাণ আব তার সাথে

আঁখিবাণ যা বেছে বেছে ছাড়েন, ঠিক যেন মিছরীর ছুরীর মত বুকে এসে বেঁধে—আর সাধতে সাধতে তো প্রাণ বেরিয়ে যাবার উপক্রম! তা ছাড়া কাজের সময় কলম আছে তো দোয়াত নেই, দোয়াত আছে তো কাগজ কোথায় উধাও হোয়ে গেছে, কাগজ পাওয়া গেলতো ব্লটিং প্যাডটা খুঁজে বার্ কোত্তে গলদ্ঘর্ম্ম,—কোথায় গেল জামা, কোথায় কাপড়, কোথায় বা গেল পকেট থেকে মণিব্যাগ শুদ্ধ টাকা পয়সা,—ফুলদানীটা রইলো উল্টিয়ে, ফাউণ্টেন্টা টেবিলের নীচে—আর কত বোল্বো? স্নান কোরে এসে চিরুণীর জন্য দাঁড়িয়ে থাক্তে হবে পূরো আধঘণ্টা, চুল আঁচড়িয়ে ভাতের জন্য থ্রি কোয়ার্টার, খেয়ে জুতো জোড়া পরিয়ে দেবার জন্য পাক্কা একটী ঘণ্টা!—”

“ইঃ—আমি যাবো বাবুর জুতো পরিয়ে দিতে? সখ্ দেখে বাঁচিনে!—আর সাধ্তেই বা কে বলে তোমায়? না সাধলেইতো পাবো! আমিতো মাথায় দিব্য দিয়ে বোলিনে তোমায়? আমি আর এবার থেকে কিছুই কোত্তে পারবোনা।—যাও।” বোলে তরুণী গম্ভীর হোয়ে মুখ নীচু কোরে খোকাকে দুধ খাওয়াতে লাগলেন। তরুণ হাস্তে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে বোল্লেন. “কিগো সত্যি রাগ কোল্লে? সেই কেষ্ট ঠাকুরের মত বোল্বো নাকি, প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চময়ী মানমনিদানম্—”

তরুণী ফিক কোরে হেসে ফেলে, বোল্লেন, “যাও, কি যে বল তুমি তার ঠিক্ নেই। ও সব দেবতাদের সাজে। ফের বোল্বে যদি তাহলে—”

লতিকা সব স্পষ্ট দেখ্তে পেলো, স্পষ্ট শুন্তেও পেলো, আর সাথে সাথে হৃদয়ের কোন্ নিভৃত কোণ থেকে এক ঝল্ক

কালি উছলে উঠে এই একটু আগে রচা মর্ম্মর সৌধখানিতে তার কালি মেখে একেবারে একাকাব কোরে দিলো।... ঐ সুন্দর যুবাপুরুষ·· ঐ সুন্দরী তরুণী··· ঐ কচি খোকাটী —তাঁদের নিবিড় অচ্ছেদ্য প্রেমের ফোটা ফুল···কি সুখী ওরা।···আর সে?

লতিকা আর ভাব্‌তে পাল্লোনা, 'পালঙ্কেব ওপোর উপুড় হোয়ে পোড়লো। অশ্রুসায়রে বান ডাক্‌লো।



কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল জানেনা, সহসা কি জানি কেন ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ চেয়ে দেখ্‌লো নরেশ জামা কাপড় ছাড়্‌ছে। গলায় আঁচল জড়িয়ে প্রণাম কোরে উঠ্‌তেই নরেশ মুখের পানে চেয়ে জিজ্ঞেস কোল্লো, "ভালো আছ?"

লতিকা হেঁটমুখে মৃদুস্বরে বোল্লে "হ্যা।" কিন্তু বুকের ভেতোর থেকে কে যেন মাথা নেড়ে ঠিক্ উল্‌টো উত্তরটাই জানাবার চেষ্টা কোরছিলো।

"তোমার দাদা, ভাই, পিশিমা?"

"হ্যাঁ।"

"মা?"

"ভালো।"

"বাড়ীর আর সবাই?"

"ভালোই আছে সব।" তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস কোল্লে, তুমি ভালো আছো?"

নরেশ গায়ের গেঞ্জিটা উল্‌টে খুল্‌তে খুল্‌তে হঠাৎ থেমে প'ড়ে বোল্লে, "আমি ? তা নেহাৎ মন্দ কি ?" গেঞ্জিটা খোলা হোতেই সে জুতোর ফিতে খোল্‌বার উপক্রম কোল্লো।

খানিকক্ষণ আগে শোনা তরুণ-তরুণীর হাস্যালাপগুলো লতিকার মনের ভেতোর চম্‌কে গেল। সে সুগোল হাত দুখানা বাড়িয়ে বোল্লে, "আমি খুলে দিচ্ছি দাও।"

নরেশ তার মুখের পানে চেয়ে হেসে বোল্লে, "আমায় কি এতই অপদার্থ মনে কর লতিকা যে জুতোটাও নিজে খুল্‌তে পার্‌বোনা, তোমায় খুলে দিতে হবে ?"

লতিকা চম্‌কে উঠে বোল্লে, "না—না, তাতো ভাবিনি !"

"ভাবোনি বটে, কিন্তু আমাকে যে আরো বেশী পরস্মৈপদী কোরে তোল্‌বার চেষ্টা কোর্‌ছো এটা কিন্তু খুবই সত্যি।"

"আর কোর্‌বোনা।"

"তাই ভালো। মা ছাড়া আর কেউ আমার জন্য কিছু কোল্লে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হয়। সে যাক সারাটা দিন ঘুরে ঘুরে ক্লান্তও যেমনি হোয়ে প'ড়েছি ক্ষিদেও তেমনি পেয়েছে ভয়ঙ্কর ! খাবারটা—"

ঘরেই লুচি তরকারি মিষ্টি চাপা দেয়া ছিল, সেই দিকে চেয়ে লতিকা বোল্লে, "ওই ধামাটার নীচে আছে আসন পেতে জল গড়িয়ে দোবো কি ?"

নরেশ একটু ভেবে হাসিমুখেই বোল্লে, "তুমি দেবে ? তা দাও। তবে আমি কোন দাবী জানাচ্ছিনে কিন্তু! অর্থাৎ ইচ্ছে হোলে দিতে পার। বুঝলে ?"

লতিকা মাথা কাত কোরে জানালো, বুঝেছে।

কার্পেটের আসনখানা পেতে জল গড়িয়ে দিতেই নরেশ তাড়াতাড়ি বোসে প'ড়ে হঠাৎ বোলে উঠলো "তুমি খেয়েছ?"

লতিকার ভারী লজ্জা কোরতে লাগলো। স্বামীর আগেই সে খেয়েছে। মাথা হেঁট কোরে নিতান্ত অপরাধিনীর মত বোল্লে, "মা কিছুতেই ছাড়লেন না।"

"খেয়েছ? তা বেশতো। অত ইতস্তত: করবার কোন কারণই নেই। একজন সারা দিন রাত বাইরে বাইরে টোঁ টোঁ কোরে ঘুরে বেড়াবে বোলে আর কেউ যে তার জন্য ঘরে বোসে নির্জ্জলা একাদশী পালন কোরবে এমন চমৎকার ব্যবস্থার আমি মোটেই পক্ষপাতী নই। আর তাছাড়া আমিতো বোলেছি লতিকা তোমাকে মা এনেছে, আমি নয়?"

লতিকা ম্লানমুখে বোসে র'ইলো।

নরেশের দৃষ্টি সেদিকে ছিলনা। সে নিবিষ্টমনে গ্রাসের পর গ্রাস মুখে তুলে দিতে লাগলো।

পূব দিকের জানালাটা তখনো খোলাই ছিল, ও-বাড়ীর জানালাটাও। কিন্তু অন্ধকার—বোধহয় তারা ঘুমিয়ে পড়েছে। ক শান্তিময় জীবন ওদের!

লতিকা ভাবছিল অনেক কথা।

নরেশ কথায় কথায় জানায় লতিকাকে তার প্রয়োজন নেই। কেন? সে কি এমনি অস্পৃশ্য অপবিত্র ফুল যে কোন পূজায়ই লাগতে পারেনা? স্বামীর মনের মত—সত্যিকার সহধর্ম্মিণীর মত নিজেকে গ'ড়ে তুলতে সে গররাজিতো নয়ই বরং খুবই উৎসুক সে। কিন্তু স্বামী কি চান, লতিকা বুঝতে পারেনা। যিনি কিছুই চান না তার চাইবার মত হোয়ে আত্ম-

প্রকাশ করা একটা সুকঠিন সমস্যার আকারে লতিকাকে ভাবিয়ে দেয়। তাছাড়া নিজেকে স্বামীর ইচ্ছার স্রোতে ভাসিয়ে দেয়াটাই কি শুধু সহধর্ম্মিণীর কাজ? অধর্ম্ম, অন্যায়, অপ্রীতিকর কোন কিছু থেকে তাকে বাইরে টেনে আনাটাও কি সহধর্ম্মিণীর কর্ত্তব্য নয়?

একটা বিশ্রী নীরবতা লতিকার অন্তরটাকে যেন অজগরের বিষাক্ত আলিঙ্গনে বদ্ধ কোরেছিল, তাই সে আর চুপ কোরে থাক্‌তে না পেরে হঠাৎ জিজ্ঞেস কোরলো, "তাই বুঝি চিঠির উত্তর দাওনি? আর এত কোরে লিখলুম, এত দিব্যি দিলুম, তবু ষ্টেশনে যাওনি?"

হঠাৎ যেন নরেশের চমক্ ভাঙ্গলো। মুখ তুলে খানিকক্ষণ লতিকার দিকে চেয়ে থেকে জিজ্ঞেস কোল্লো, "কি বোল্লে?"

"বোল্‌লুম, এত কোরে লেখবার পরও ষ্টেশনে গেলে না যে!"

"কেন, গেলুম তো। তবে ঠিক সময় মত যেতে পারিনি একটু কাজ ছিল তাই। আর তোমাদের সাথে আস্‌তেও পারিনি বটে। তা কোন অসুবিধে হয়নিতো? সুরেশ কি সব ঠিক ম্যানেজ কোরে নিয়ে আস্‌তে পারেনি।"

লতিকা চুপ কোরে র'ইল। নরেশ একটু পরে আবার প্রশ্ন কোল্লে, "কোন অসুবিধে হোয়ে থাক্‌লে বোল্‌তে পারো।"

লতিকা জবাব দিলে, "অসুবিধে হয়নি বটে, কিন্তু তুমি গেলে সুবিধে গুলোই আনন্দদায়ক হোতো।"

"কেন? সুরেশ যাওয়াতে কি দুঃখ পাবার কোন কারণ হোয়েছে?"

লতিকা হেসে বোল্লে, "না, তা নয়। তবু মেয়েদের কাছে স্বামী আর দেবরে অনেক তফাৎ নয় কি?"

একটা গ্রাস মুখে তুলে দিতে দিতে নরেশ বোল্লে, "একজন নিয়ে এলেইতো হোলো। আমাকে কি দরকার তোমার ?"

দরকার !—তার মুখের দিকে চেয়ে লতিকা বোলে উঠ্‌লো, "দরকারের কথা জিজ্ঞেস কোরছো ? তবে আর কি বলি বল। এ দুনিয়ায় একজন আর একজনকে কেন নিশিদিন কাছে কাছে পেতে চায়, কেন সে উঠ্‌তে বস্‌তে চলতে ফিরুতে অহর্নিশি তার পরশ কামনা করে, কেন একজন আর একজনের জন্য প্রাণ দিতেও পেছ-পা হয়না—এর জবাব কি কেউ দিতে পারে ? নিজের অন্তর খুঁজে দেখতে হয়, মুখে শতবার বোলেও কেউ বুঝিয়ে দিতে পারে না।"

নরেশ নিঃশব্দে আহার সমাধা কোরে উঠে দাঁড়ালো। মুখ ধুয়ে গামছা দিয়ে হাত মুছ্‌তে মুছতে বোলে উঠলো, "ব্রাকেট থেকে জামা কাপড় গুলো গেল কোথায় ? বাঃ—একটাও যে নেই দেখ্‌ছি !"

লতিকা উত্তর দিলে, "সে গুলো আলাদা কোরে রেখেছি; কাল্‌কে ডাইংক্লিনিংয়ে যাবে।"

"কেন, ও গুলোতো আরো কদিন পরা চল্‌তো।"

"থাক্, আর পরে কাজ নেই—ময়লা হোয়েছে।—আচ্ছা, অত মোটা কাপড় তুমি পর কি কোরে বলতো ? মাগো ! এক একখানা যেন এক একটা বোঝা !"

নরেশ হেসে বোল্লে, "কেন, তুমি কি মনে কর লতিকা, তুমি যা পারোনা তা আর কেউই পারবে না ?"

লতিকা একটু ভেবে জবাব দিলো, "না তা কেন নিশ্চয়ই

পারে।—তবে আপন জনকে অনেক সময় অনেক কাজ থেকে ফিরিয়ে আন্‌তে হয় না কি ?”

“হ্যাঁ, তা হয় বটে, কিন্তু আমাকে আপ্‌নাজন মনে কোত্তে তোমায়তো আমি বারণ কোরে দিয়েছি—এই একটু আগেও।—আর তাছাড়া আমায় খদ্দর পরা থেকে ফিরিয়ে আন্‌বে যদি মনে কোরে থাকো, তাহ’লে জেনো সে চেষ্টা তোমার চিরদিনই ব্যর্থ হোয়ে যাবে।”

নরেশ টেব্‌লের কাছে চেয়ারটায় বোসে পড়লো। সবিস্ময়ে দেখ্‌লে কোথাও ধুলো বালি জমে নেই, কাগজ পত্তর বইগুলো কে যেন ঝেড়ে মুছে সযত্নে গুছিয়ে রেখেছে। একবার লতিকার মুখের দিকে চেয়ে কোন প্রশ্ন না কোরেই সে রাইটিং প্যাড্‌টা খুলে চিঠি লিখতে বোস্‌লো।

লতিকা স্তব্ধ হোয়ে চেয়ে রইল। ··· ··· এই তার স্বামী, তার জীবনের দেবতা, যিনি তাকে প্রতিজ্ঞে কোরে বিয়ে কোরেছেন

“যদেতদ্‌ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব॥”

অথচ যিনি সে সম্বন্ধ পদে পদে অস্বীকার কোত্তে চান, তাকে ছেড়ে এই মুহূর্ত্তে পরপারে চলে যেতেও পেছ্‌পা নন—গোটাকয়েক চটের মত মোটা মোটা কাপড়ের জন্যে!... ... বিয়ের সময় পিশিমাকে বোল্‌তে শুনেছিল, “এমনি রাজপুত্তুরের মত জামাই আমার, লতিকা সুখে থাকবে!”—সত্যি, রাজপুত্তুরের মতই বটে, অমন চোখ, অমন মুখ, অমন গায়ের রং, লম্বা চওড়া পুরুষোচিত চেহারা···কিন্তু নেই শুধু একটা

জিনিষ, যার দারুণ অভাব নারীর সমস্ত সুখ, সমস্ত শান্তি, সমস্ত তৃপ্তির বুকে নিঠুর ভাবে হাতুড়ি পিটৃতে থাকে !...

কে তা বুঝবে !...কে তা জান্‌বে !...

বিছানায় শুয়ে নরেশ যখন ওপাশ ফিরে নিঃশব্দে ঘুমোবার চেষ্টা কোরতে লাগলো, লতিকার তখন আর সহ্য হোলো না। একটু ইতস্তুতঃ কোরে সহসা সে সে তিক্তস্বরে বোলে উঠ্‌লো, "আচ্ছা, বোল্‌তে পারো, তোমার মত শুক্‌নো কাট—ছুনিয়ায় আর কখানা আছে ?"

নরেশ সহসা প্রশ্নটা বুঝে উঠতে না পেরে জিজ্ঞেস কোল্লে, "কি বোল্লে বুঝলুম না।"

বিরক্তিতে লতিকার মন পুড়ে খাক্ হোয়ে গেল। এ অপ্রিয় প্রসঙ্গ তুলে বৃথা সময় নষ্ট না কোরে সে তার পাথর স্বামীকে ঘুমোবার অবকাশ দেয়াই সমীচিন বোধ কোরলো।

নরেশ একটু ভেবে এ পাশে ফিরে সস্নেহে বোল্লে, "কি বোলছিলে বল না আর একবারটী। সারাদিনটা সাইকেলে ঘুরে ঘুরে ভারী ক্লান্ত হোয়ে পড়েছি, তাই কেমন চোখ ভেঙ্গে আস্‌ছিল। আচ্ছা, আর ঘুমোবোনা, বল।"

একটুখানি স্নেহ আদরের মধুর স্পর্শেই লতিকার প্রাণে পুলক বন্যা বইয়ে দিলো। সে একটু সরে এসে অন্ধকারে চোখের জল মুছে ফেলে বোল্লে, "আমায় বিয়ে কোরে তুমি মোটেই সুখী হওনি, না ?"

নরেশ হেসে জিজ্ঞেস কোল্লে, "কে বোলেছে ?"

"একি আর বোলে দিতে হয় ? নিজের মনই বোলে ছায়। সত্যি বল না, আমায়—কি একটুও ভালবাসনা তুমি ?"

নরেশ একটু ভেবে বোল্লে, "বাসি। একটু কেন, বোধহয় অনেকখানিই বাসি। কিন্তু কি—জানো ?"

"বল ?"

"আর একজনকে তোমার চেয়েও আরো অনেক বেশী ভালবাসি।

লতিকার বুকের ভেতরটা প্রবল ভূমিকম্পের মত দুর দুর কোরে কেঁপে উঠলো, রুদ্ধশ্বাসে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস কোল্লো, "কা·—কে !"

নরেশ বোল্লে, "আমার এই দেশকে, এর জল-বায়ু-মাটিকে এর চাষা,—মুটে-মজুর-কুলি-মেথরকে। তোমার সাথে আর কদিনের সম্বন্ধ বল ? কিন্তু এর সাথে যে আমার কত জন্ম জন্মান্তরের সম্বন্ধ রোয়েছে লতিকা ! তাইতো তোমার চেয়ে দেশের দারিদ্র্য, দেশের দৈন্য, আরো বেশী কোরে টানে আমায়। তুমিও কি তাই চাও না ? তুমি কি চাও, বাইরে প্রলয় হোয়ে যাক্, সবলের কশাঘাতে দুর্ব্বলের দেহে রক্তের ধারা ঝরে ঝরুক্, তুমি তোমার স্বামীকে ঘরের কোণটীতে আঁচলের আড়ালে লুকিয়ে রাখবে প্রেমের নিগড়ে বেঁধে ?···"

লতিকা স্তব্ধ বিস্ময়ে কান পেতে শুন্‌তে লাগলো। এ যেন এক নতুন কথা···নতুন বার্ত্তা !...

নরেশ বোলতে লাগলো, "বিয়ে করবার আমার একটুও ইচ্ছে ছিল না লতিকা। আমার এই অবসরহীন অনিশ্চিত জীবনের সাথে আর কারো সাধ আকাঙ্ক্ষাময় জীবনকে গেঁথে অপূর্ণ অতৃপ্ত কোরে তুলতে চাইনি আমি। কিন্তু মার চোখের জল আর সইতে পাল্লুম না, তাই তাকে বৌ এনে দিয়েছি। ব্যস্,

আমার কাজ ফুরিয়ে গেছে। স্বীকার করি অন্যায় কোরেছি, তোমাকে আনা উচিত হয় নি; কিন্তু কেউ কি সারাজীবন শুধু ন্যায় কোরেই কাটিয়ে দিতে পারে? ভুল কি কারো হয় না? তা হ'লে তো পৃথিবী শুধু নামে নয় কাজেও অচলা হোয়ে যেতেন!"

লতিকা আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস কোল্লো, "এনে অন্যায় কোরেছো তো ভালবাস কেন?"

"ভালবাসি কে বোল্লে?"

"এই যে একটু আগেই বোল্লে তুমি?"

নরেশ জবাব দিলো, "হ্যাঁ, তা বাসি সত্যি। কেন, তাতো জানিনে। কিন্তু তাই বোলে আমার এই সৃষ্টিছাড়া জীবনটার ভার তোমার কাঁধে আমি জোর কোরে চাপিয়ে দিতে চাইনে লতিকা! আমার সত্যিকার সুখ দুঃখের আদ্ধেকটা তোমায় দিতে পারি আমি, যদি কোনদিন তুমি আমার মত পাথর দিয়ে নিজের বুকখানা গ'ড়ে তুলতে পারো, আর নিজে থেকে তা নিতে চাও।...

তারপর একটু চুপ কোরে থেকে আবার বোল্‌তে লাগ্‌লো, "কাল্‌কে একটা সভায় বক্তৃতা দিতে হবে আমায়। বক্তৃতা কোনদিন দিইনি। কি ক'রে সাজিয়ে গুছিয়ে বোল্‌তে হয়, বড় বড় শব্দ যোজনা কোত্তে হয়, নিজেকে বাঁচিয়ে চল্‌তে হয়, সে সব জানিনে। শুধু জানি যদি কিছু বোল্‌তে হয়তো সোজা স্পষ্ট ভাষায় বুকের ভেতরকার সত্যটাকে প্রাণবন্ত কোরে তুল্‌বো। একটী হৃদয়ও কি স্পর্শ কোরবেনা...... একটী বুকও কি ভয়ে উঠ্‌বেনা তা'তে?

লতিকা মুগ্ধ বিস্ময়ে স্বামীর পানে চেয়ে রইলো।—একটা কথা বার বার তার মনের কোঠায় ঘুরে ফিরে বেড়াতে লাগ্‌লো। "আমার মত পাথর দিয়ে নিজের বুকখানাকে যদি……" পাথর? কেন, সে কি পাথর হোতে পারে না? স্বামী যদি তার নিস্পৃহ জিতেন্দ্রিয় হোতে পারেন, স্ত্রী হোয়ে সে কি তা পারেনা নাকি?…

ধীরে ধীরে সে তার ডান হাতখানা বাড়িয়ে নরেশের এলো মেলো চুলগুলোর ভেতোর আঙুল চালাতে লাগ্‌লো —অন্যমনস্কভাবে।……কারা বেশী সুখী? ঐ ও-বাড়ীর পুত্রক্রোড়ে সুপ্ত দম্পতি, না তারা নিজে? …..

* * * *

পরদিন সন্ধ্যেবেলা সহসা সুরেশ এসে চীৎকার কোরে জানালো, "মা, বৌদি, সর্ব্বনাশ হোয়েছে! দাদাকে মিটিং থেকে পুলিশে অ্যারেষ্ট কোরে নিয়ে গ্যাছে—ইলিসিয়াম্ রো তে।"

লতিকা থম্‌কে দাঁড়ালো। উদ্বেল অশান্ত হৃদয়টাকে দমিয়ে রাখ্‌বার বৃথা চেষ্টায়, ব্যাপারটাকে সহজভাবে হাসিমুখে বরণ কোরে নেবার নিষ্ফল আগ্রহে তার সুন্দর মুখখানা বিশ্রী হোয়ে উঠ্‌লো। মনে হোচ্ছিল তার গলা বেয়ে কি যেন সবেগে ওপোরে উঠ্‌তে চাচ্ছে। কি সে?……অশ্রু?……না রক্ত?

লেখিকা -রাণী সুরুচিবালা চৌধুরাণী



সত্যবালা তখন উপরের বারান্দায় ব'সে বামুন ঠাকুরকে বলছিলেন—"ঠাকুর, চিংড়ির কালিয়াটা আজ বেশ ভাল ক'রে রেঁধো বাছা, আমার নরেশ বড্ড ভালবাসে, আর—" মুখের কথা মুখে রয়ে গেল, সত্যবালা "এ্যা—কি বল্লিরে সুরেশ ?" ব'লে উঠে দাঁড়ালেন।

. নীচে বাঁধানো উঠোনে দাঁড়িয়ে সুরেশ তখন কি বল্‌ছিল, আর শৈলেশ্বর বাবু অত্যন্ত ব্যস্ত উদ্বিগ্ন হয়ে চাৎকার করে কতগুলো কি বলছিলেন।—"মিটিংএ অসংখ্য লোকের ভিড় হয়েছিল, অন্যেরা সকলেই বক্তৃতা দিলেন, কিন্তু শেষকালে দাদা উঠে বক্তৃতা দেবার পরেই পুলিশ এ্যারেষ্ট করলো ;—দাদা খুব সিডিসাস্‌ কথা বলেছেন বলেই তো—"

তারপরে—"সুরেশ, একি সর্ব্বনেশে কথা বাবা! কি করি ? ও গিন্নি! শুনছো নরেশের কাণ্ড, কি করা যায় ? এখন ছাড়াবার ব্যবস্থা করতে হয় যে, যাই দেখি বিনয় বাঁড়ুয্যের বাড়ী ; ওরে আমার জামা আর লাঠিটা দে, আর আমার মোটর—মোটর, হরিচরণ নেই ? ব্যাটাকে দেবো আজই তাড়িয়ে—কাজের সময় কোথা গেল সে ? তবে ট্যাক্সি, ট্যাক্সি শিগ্‌গির—" নিমেষে কর্ম্মচারী, চাকর বাকর যে যেখানে ছিল সকলে সব কাজ ফেলে

সেইখানে জড় হ'য়ে নানা কথায়, নানা প্রশ্নে বিরাট একটা গণ্ডগোল বাধিয়ে তুললো।

ওদিকে উপরে একটা পাটীর উপর সত্যবালা তখন চোখ বুজে শুয়েছিলেন, আর লতিকা একহাতে একটী হাতপাখা নিয়ে, আর একহাতে ধীরে ধীরে শাশুড়ীর চুলে কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল।

দু'জনেই নিস্তব্ধ, দু'জনের অশান্ত বুকের তুমুল আলোড়ন স্থির হয়ে গিয়েছিল এক অজানা শঙ্কায়, পাছে একজনার বুকের প্রবল তুফান, আর একজনার জোর ক'রে তুলে দেওয়া বালির বাঁধ ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দিয়ে বন্যার প্লাবনে চারিদিক ভাসিয়ে দেয়, এই ভয়ে। সারা বাড়ীটা তখন স্তব্ধভাব ধারণ করেছে, প্রথম ঝড়ের বেগ থেমে গিয়ে প্রকৃতির ললাটে ধীরে ধীরে তখনো মেঘ জ'মে উঠছিল, বুঝি আর একবার আর এক ধ্বংসলীলা অবতারণার অপেক্ষায়! সকলে যে যার কাজে চ'লে গেছে। শুধু সন্ধ্যার অবসান প্রায় ধূসরতা গাঢ় হয়ে কুহেলিকাময়ী প্রকৃতির বুকখানি ভ'রে দিচ্ছিল, অন্ধকারে—হতাশায়। অস্ফুট কাতোরক্তি ক'রে সত্যবালা পাশ ফিরলেন, লতিকা মাথাটা নীচু ক'রে জিজ্ঞেস কর'লো—"একটু কম্‌লো মা?" তিনি কোন উত্তর দিলেন না। সারা প্রাণ তাঁর মথিত ক'রে জেগে উঠছিল বুঝি তাঁর অকৃতকার্য্যতার আক্ষেপ, সঙ্গে সঙ্গে বধূরও। মনে হচ্ছিল জোর ক'রে বিয়ে না দিয়ে নরেশের ইচ্ছামত, পছন্দমত বৌ এনে দিলে, আজ এমন ক'রে সে গিয়ে হয়তো নিজেকে ধরা দিতনা। কি জানি, বৌ কি কোন কথায় বা কাজে উত্যক্ত ক'রে ঘরের ছেলেকে এমনি ক'রে দূরে সরিয়ে

দিল? নইলে কেন এ সর্ব্বনাশ হ'ল? হঠাৎ এককোঁটা জল তাঁর কপালে টপ্‌ ক'রে পড়লো, সঙ্গে সঙ্গে তাঁব মাতৃহৃদয় বৌয়ের প্রতি সমবেদনায় ভ'রে উঠলো। তিনি ভাবলেন, তাই বা কি ক'রে বলা যায়? কেউ কি ইচ্ছে করে নিজের স্বামীকে এভাবে বিপদের মুখে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে? মেয়েটার কি দোষ? সব দোষ তাঁর অদৃষ্টের আর কিছুর নয়। তারও ক্ষুদ্র বুকটী হয়তো কত ব্যথায় ভরে, আশঙ্কায় উদ্বেলিত হ'য়ে উঠেছে আজ—সেও হয়তো তারই মত অব্যক্ত যন্ত্রণায় মুসরে পড়েছে। একটু পরে জিজ্ঞেস করলেন—"বৌমা, কাল এবিষয়ে নরেশ কিছু বলেনি?"

বধূ নত মুখে বললো—"হ্যাঁ মা কিছু কিছু বলেছিলেন"—

শাশুড়ী রুদ্ধস্বরে অনুযোগ করলেন—"তবুও তুমি চুপ ক'রেছিলে বারণ করলেনা?"

খানিক পরে বধূ উত্তর দিল—"বারণ করলেও যে শুনতেন না মা—" শেষের কথাগুলো একটু কেঁপে গেল। আবার মৌন নিস্তব্ধতায় দু'জনে ডুবে গেল, দুই ব্যথিতার মর্ম্মবেদনা আজ যেন একসঙ্গে মিলে এক হ'য়ে গিয়েছিল।

পা টিপে টিপে সুরেশ উপরে এসে ধপ্‌ ক'রে মায়ের পাশটীতে ব'সেই ডাকলো—"মা—! কি হয়েছে বৌদি? মা—"

সুরেশ মায়ের কপালে মুখে হাত বুলিয়ে দিল। লতিকা ধরা গলাটা পরিষ্কার ক'রে বললো—"মার মাথা ঘুরছে ঠাকুর পো।"

সুরেশ বললো—"মাথা ঘুরছে—না তোমরা কাঁদছ! এতে কাঁদবার কি আছে? কেঁদোনা। যদি তোমরা সেখানে থাকতে তা'হলে কাঁদতে না, জানোনা, সে কি দৃশ্য। দাদাকে যখন

ধ'রে নিয়ে গেল, তখন চারিদিকে সে কি চীৎকার—'বন্দেমাতরম্‌ —গান্ধী জী কি জয়' সে জয়ধ্বনি শুনলে অবাক হতে তোমরা বোধ হয়! তারপরে চারিদিক থেকে ফুলের মালা পড়তে লাগলো অসংখ্য—দাদার মাথা পর্য্যন্ত উঁচু হ'য়ে উঠলো মালায়, চারিদিক থেকে একস্বরে শঙ্খ বেজে উঠলো—বাবা মিছেই গেছেন দাদা আসবেন না।"

সত্যবালা চোখ খুললেন। রগের দু'পাশ দিয়ে ঝর ঝর ক'রে খানিকটা জল ঝরে পড়ল। সে কি গৌরবের আনন্দে—? না মাতৃহৃদয়ের যুক্তিহারা ব্যথায়? লতিকা মুখটা ফিরিয়ে নিল। সত্যবালা বললেন—"কাঁদছিনা সুরেশ। আমি ব'লে নয়, আজ আমার মত অনেক মা-ই কাঁদতে ভুলে গেছে জানি—। কিন্তু—তবু, বাবা! মায়ের মন যুক্তি মানে না। তর্ক বোঝে না! সুরেশ! সে বলেছে আসবে না?—"

"তা কিছু বলেন নি—"

"তুই বললি যে?"

"বললুম, মনে হয় তাই।"

সত্যবালা উঠে বসলেন। লতিকা আবার ধরা গলাটা পরিষ্কার ক'রে বললো—

"এখন একটু ভাল লাগছে মা? আর একটু গোলাপ জল দিয়ে দেবো?"

"না মা, থাক,—"একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন—"সে কি বললো?"

"বিশেষ কিছু না, যখন নিয়ে যাচ্ছিল তখন আমি কোন রকমে ভিড় ঠেলে, কাছে গিয়ে ডেকেছিলুম 'দাদা—' দাদা

আমার ডাক শুনতে পেয়ে ফিরে বললেন 'তুমি বাড়ী যাও সুরেশ, মার কাছে তুমি থেকো। আর বলো মায়ের চোখের জল যেন আমার শুভ যাত্রা পথে অকল্যাণ ঢেলে না দেয়,—আর কিছু না—" সত্যবালা জোরে চোখ দুটো বন্ধ ক'রে খানিকক্ষণ বসে রইলেন।—বোধহয় অশ্রুর উৎসকে বোধ করবার জন্যই।—আর লতিকা,—সে তখন জোর করে একটী হাত দিয়ে বুকখানাকে চেপে ধরেছিল বুঝি এখনি তা ফেটে ছড়িয়ে পড়বে চারিদিকে—। সত্যবালা আবার শুয়ে বললেন—"তুই যা একটু হাতে মুখে জল দে সুবেশ। দিয়ে মুখে কিছু দে। বৌমা, কাপড় চোপড় কেচে এসো মা—"

লতিকা মৃদুস্বরে বললো—"ক্ষমাকে ডেকে দেবো মা? মাথায় একটু হাওয়া দেবে?"

"না থাক্—ওঁদের ফিরতে কত দেরী হবে বে?"

জানিনে তো মা! দেরী হ'তেও পারে, নাও হ'তে পারে—"

"তা যদি আসে তবে এঁদের সঙ্গেই আসবে তো সে?"

"হ্যাঁ, এলে তো এই সঙ্গেই আসবে—তাও ওরা যদি জামিনে ছাড়ে তবে তো—"

"তুই যা বাবা, একটু জল টল খা—আমি তো উঠতে পারছি না—"

সুরেশ বললো "সে দরকার হবেনা মা, আমি একটু সরবৎ খেয়েছি, আর কিছু খাবোনা, তার চেয়ে তোমার কাছে বসি—বৌদি কাপড় কেচে আসুন। তুমি বেশী ভেবো না মা। আর এমন করে শুয়ে থেকোনা—ওঠো।"

"দীর্ঘনিশ্বাসে বুক কাঁপিয়ে মা বললেন "ভাবনা—ভাবছিনা

সুরেশ, ভাবনা যেন মাথার ভেতর সব তাল গোল পাকিয়ে গেছে !”

লতিকা তখনো দাঁড়িয়েছিল চুপ করে। শাশুড়ী বললেন “বৌমা, সন্ধ্যে উৎরে গেল চুলক’টা জড়িয়ে এসো বাছা, আর কেন অকল্যাণ ডেকে আনছ ?”

লতিকা ধীরে ধীরে চলে গেল তার নিজের ঘরের দিকে ! তার পা কাঁপছিল। বুকের পাঁজর গুলো যেন ধসে ধসে ভেঙ্গে পড়ছিল। তবু চোখের জল সে চেপে রেখেছিল, তার সবটুকু শক্তি দিয়ে। স্ত্রীর চোখের জলেও স্বামীর অকল্যাণ হয় যে। সে শিউরে উঠে ভাবলো বুকখানা তার আগুনের সর্ব্বগ্রাসী শিখায় পুড়ে যায় যাক্—কিন্তু না গো না, সে স্বামীর অমঙ্গল রচনা ক’রে তাতে এক ফোঁটাও সান্ত্বনার অশ্রু জল ঢেলে দেবে না। সে নিজেকে যথেষ্ট অপরাধী মনে করেছিল কারণ সে জানতো, বুঝতো যে শাশুড়ী তার স্বামী বশ করার অপারগতায় মাঝে মাঝে বিরক্ত হতেন, কিন্তু কি করবে সে ? সে যে নিজের অপারগতায় নিজেই নিজেকে যথেষ্ট ধিক্কার দিয়ে এসেছে এতদিন ! কিন্তু তার অপরাধ কি ? শাশুড়ীর চোখে, স্বামীর চোখে, জগতের চোখে তার অপরাধের মাত্রা কতখানি সে নিজে তার ওজন ক’রে বিচার করে দেখতে যায় কিন্তু পারেনা,—পারেনা, নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করে তার অপরাধ কি ?

প্রথমে অভিমান হ’ল তার স্বামীর উপর, কাল তার কানে প্রথম মহামন্ত্রের বীজ রোপণ ক’রে আজই তাকে ছেড়ে গেল সে কেন ? অপেক্ষা করলো না সে তাকে পরীক্ষা ক’রে

দেখবার জন্য, অন্ততঃ একটী দিনও যে সে তার মত পাথর দিয়ে নিজের বুকখানা গড়ে তুলতে পারল কি না! স্বামীকে ঘরের কোণটীতে আঁচলে বেঁধে সে রাখতে চায়নি। কিন্তু একবারও সে কি ভাবলো না যে সেই আঁচল দিয়েই সে তার কর্ম্মপথের আস্তরণ রচনা করতে পারে? এই কি বিচার? না এ স্বার্থপরতা ? তাকে এতটুকু অবসর না দিয়ে, তাকে একবার জিজ্ঞাসা না করে এক মুহূর্ত্তে সব সমস্যার সমাধান করে সে তাকে সাথে নেবারও উপযুক্ত বিবেচনা করলো না? ওগো একি নিষ্ঠুরতা? কত কি যে রয়ে গেল করা হ'লনা, বলা হ'লনা, তারপরে সেও তো তারই হাত ধ'রে সঙ্গে যেতো মরণের দ্বার পর্য্যন্তও। সে সাহস সে তার পরখ করলো না কেন? কেমন বীর সে? নিজের জীবন-সঙ্গিনীকে শত সমালোচকের চোখের সামনে অপরাধীর আসনে বসিয়ে, সে নিজে গেল জয়ের মালা গলায় প'রে দিগ্বিজয়ের আনন্দ লুঠ করতে! সে নিজের ঘরে ঢুকলো। সমস্ত ঘর বিছানা টেবিল চেয়ার সবই যেন দারুণ উপহাসে তাকে জর্জ্জরিত ক'রে তুললো। তারই এদিক ওদিক ছড়ানো বইগুলি তেমনি আছে, ঐ পাম্পস্থ জোড়া কাল ঐ খানেই এসে ছেড়েছিল তাও তেমনি আছে, সে ভাবলো থাক্ সবই থাক্—তার স্মৃতির চন্দন মেখে ওগুলো যেমন আছে তেমনি থাক। সে চিরুণীটা নিয়ে চুলে বসিয়ে আবার ডুবে গেল ভাবনার অতল তলে। ঘরের আলো সে জ্বালেনি, চুপ ক'রে ব'সে ছিল সে অন্ধকারে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে!

পাশের বাড়ীতে কত কি কথা হচ্ছিল। ভাবনার জাল

ভেদ ক'রে কতগুলো কথা তার কানেও এসে বাজছিল। তরুণটি বলছিল—"ওগো শুনছ,—মিটিং এ আমাদের পাশের বাড়ীর নরেশবাবু, সে কি বলবো—সুন্দর মুখে তার সে জয়ের হাসি।—নির্ভীক তেজস্বিতা—সুন্দর। তুমি তো এসব বুঝবে না।—শুধু আছ আমার গুছোনো কাজ এলো মেলো করতে—"

"কে? আমাদের এই বাড়ীর নরেশ বাবু? এই যে সেদিন বিয়ে হ'ল? আহা বৌটী—!—"তরুণী করুণ দৃষ্টিতে সহানুভূতি মাখিয়ে এ বাড়ীর দিকে চাইলে।

"আহা বৌটী—আর বলতে হয় না।—কত বড় গর্ব্ব আজ তার, দেশের কাছে, দশের কাছে,—সে বুক ফুলিয়ে বলতে পারবে, তার স্বামী দেশের দুর্দ্দিনে চুপ ক'রে ঘরে ব'সে ছিল না,—আমিও তোমাকে একদিন সে গৌরব এনে দেবো গো। একদিন তুমিও বলতে পারবে—রক্ষে কর। তুমি ও সবে যেয়ো টেয়ো না। যেমন আছি এই ভালো—"

লতিকা স্তব্ধ হ'য়ে শুনতে লাগলো। সত্যি গর্ব্ব তার হয় বৈকি! কিন্তু আবার তরুণীর মত তারও তো বলতে ইচ্ছে হয় "না গো না। তুমিও যেয়ো না,—দুখে সুখে ঘেরা সংসার পেতে এই খানেই আমরা শান্তির রাজত্ব সৃষ্টি করি—"। স্বামী তাকে কোন স্থান না দিক, সে তাকে না চা'ক—কিন্তু সে তো তার সর্ব্বস্ব—! গৌরবের উচ্চ সিংহাসনে বসলেও অন্তরের অসীম ক্ষুধা যে মিটবার নয়,—সে কথা কাউকে তো বলা যায় না, জানানো যায় না, ইষ্ট মন্ত্রের মতনই সে যে গোপনীয়, প্রিয়, অন্তরের সুপ্ত কোণে সে জেগে উঠে, আবার সেইখানেই তা' বেঁচে থাকে বসন্তের মধুর বিতানে হাজার কোকিলের কলরবে।

আর যে সে পারে না গো—! দারুণ ব্যথার ভার বুকে নিয়ে সে কি সারা জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে? স্বামী কি তার ফিরবে না? মাঝে মাঝে আশার মধুময়ী বাণী তার কানে কানে ব'লে যাচ্ছিল,—যদি আসে!—যদি আসে? ঠাকুর! যেন তাই হয় তাই হয় গো! তাকে একবার দেখাতে দাও, বোঝাতে দাও, তারও কতখানি শক্তি আছে, সামর্থ্য আছে—,সে দুর্ব্বল নয় —কোমল নয়। সেও পাষাণ হতে পারে—পাহাড় হতে পারে।

নীচে আবার গণ্ডগোল জেগে উঠলো। লতিকা তাড়াতাড়ি চুলটা কোন রকমে জড়িয়ে দ্রুতপদে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো। নীচে সকলে ফিরে এসেছেন। প্রাণ তার দুরু দুরু ক'রে কেঁপে কেঁপে উঠছিল, আশঙ্কায়—আনন্দে, ফিরে এসেছে কি? শশুরের গলা সে শুনতে পেল—"সে এলো না, তা ছাড়া শুধু জামিনে ছাড়বে না তো একটা এগ্রিমেণ্ট দিতে হবে—কিন্তু সে তো তা দেবে না, কোথাকার গেড়ো কোথায়! কি কাণ্ড! ছি!—আগে থেকে বলছি—বিনয় বাবু বড় এ্যাটর্ণি, শৈলেশ্বর বাবুর বন্ধু, তিনিও সঙ্গে এসেছিলেন, তিনি বল্লেন—"চলুন এখন মাথা ঠাণ্ডা ক'রে ব'সে একটা পরামর্শ করা যাক্—ছেলেটাকে বাঁচাবার উপায় তো করতে হবে!—'

আরো কয়েকজন ভদ্রলোক সঙ্গে ছিলেন সকলে সমস্বরে এই কথা নিয়েই আলোচনা করতে করতে বৈঠকখানা ঘরে ঢুকলেন—ক্রমে সকলের গলা নীচু হ'য়ে এলো।

লতিকা চুপ ক'রে দাঁড়িয়েছিল রেলিং ধরে। যে একটু খানি আশা তার ক্ষীণ রশ্মি বিকীরণ ক'রে মিট মিট্ ক'রে জলছিল

এতক্ষণ তাও এক ফুৎকারে কে যেন নিবিয়ে দিল। এই তার জীবনের আরম্ভ—সানাইয়ের মধুর রাগিণী মিলনের সুর ধ্বনিয়ে তুলতে না তুলতে কে এমন ক'রে থামিয়ে দিল গো! তার চমক্ ভাঙলো, ক্ষমা বলছিল "বৌ দি মণি বাইরে পান চাইছেন।" হঠাৎ তার মনে হ'ল শাশুড়ীর কথা, সে তাড়াতাড়ি চলে গেল। সত্যবালা তখনো সেখানে সেই ভাবে শুয়েছিলেন। লতিকা ধীরে ধীরে ডাকলো "মা—" সত্যবালা বৌয়ের মুখের দিকে চোখ খুলে চাইলেন, তাঁর চোখে তখন হতাশার বেদনা জলন্ত হয়ে উঠেছিল, তিনি বললেন "বৌমা, তাকে জামিন দিয়ে আনতে চেয়েছিলেন সে এগ্রিমেণ্ট দিলনা, এলোনা, মায়ের মুখ চাইল না সে—একটু হাতটা ধর মা। আমি বিছানায় শোব—।" লতিকা হাত ধরে তুলে বললো—"কিছু খাবেন না মা?—"

"খাওয়া—? আমি খাবো কোন প্রাণে মা, আমার নরেশ যে খেলনা—" লতিকার চোখ দুটো কড় কড ক'রে উঠলো। সে আর কিছু বলতে পারলো না—ধ'রে ধ'রে শাশুড়ীকে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল।

রাত্রে সত্যবালা কোন মতে খেলেন না, লতিকাও খেলো না, কিন্তু সুরেশকে সে সামনে বসে খাওয়ালো। সুরেশ খেতে খেতে অনর্গল ব'কে যেতে লাগলো—এই মিটিংএর কথা, নরেশের কথা,—লতিকা শুধু চুপ ক'রে শুনছিল। ঘুমোতে যাবার সময় সুরেশ মায়ের কাছে দাঁড়িয়ে বললে—"মা, কেন দুঃখ করছ বলতো? কি হয়েছে? দাদা দেশপূজ্য হয়ে গেলেন, আর তোমরা ঘরে ব'সে শুধু দুঃখই করছ। রাস্তায় আসতে আসতে কত শুনলুম,—সকলের মুখে শুধু দাদারই নাম।"

সত্যবালা কিছু বললেন না খানিকক্ষণ, তারপরে জিজ্ঞেস করলেন—"খাওয়া হয়েছে তো?"

সুরেশ ডান হাতটা নাকের কাছে তুলে ধ'রে বললো—"হুঁ—চিংড়ির কালিয়াটা যা চমৎকার হয়েছিল—"মায়ের বুকে আবার নতুন ক'রে কি যেন একটা ধাক্কা দিয়ে গেল। তিনি "যা, ঘুমো গে বাবা! আর রাত করিসনে—"ব'লে পাশ ফিরলেন।

শৈলেশ্বরবাবু সব পরামর্শ সেরে অন্দরে খেতে এলেন একটু বেশী রাত্রে। লতিকা তখনো বারান্দায় বসেছিল শ্বশুরের অপেক্ষায়। তিনি খেতে বসতে সে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে রইল। বিনয়ী অমায়িক, কোমল হৃদয়সম্পন্ন শ্বশুর লজ্জায় বৌয়ের মুখের দিকে চাইতে পারছিলেন না। বধূর প্রতি পুত্রের এতখানি ঔদাসিন্যের জন্য যেন তিনিই দায়ী। আজ যে নরেশ বিপদ-সাগরে ঝাঁপ দিয়ে নিজেকে ডুবিয়ে দিল কোন অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতের অতল সাগরে, সংসারের কারোদিকে না চেয়ে এই যে সে চ'লে গেল, অন্য পথ ধ'রে, তার জন্য যেন তিনি নিজেই অপরাধী, এই কিশোরী, সরলা, বধূর কাছে। নিতান্ত স্বার্থপরের মত কাজ করেছেন তিনি, নিজের পুত্রকে বাঁধবার জন্য একটা নিরপরাধ জীবন ব্যর্থ ক'রে দিয়ে। তিনি ডাকলেন—"বৌমা—" স্নিগ্ধস্বরে "বাবা"—বলে লতিকা মাথার কাপড়টা টেনে দিয়ে ঘরে ঢুকলো। শৈলেশ্বরবাবু তার মুখের দিকে চেয়ে দেখে আবার চোখ সরিয়ে নিলেন,—লতিকার স্থির দৃষ্টি; শুকনো চোখ; কঠিন মুখ যেন তাকে শত তিরস্কারের মৌন সঙ্কেতে জর্জ্জরিত ক'রে তুললো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন—"মা

খেয়েছ ?" লতিকা কিছু বললো না, নীচের দিকে চেয়ে শুধু পায়ের ন'খে মাটী খুঁটতে লাগলো !

"খাওয়া হয়নি ? সঙ্গে সঙ্গে কি তোমরাও পাগল হ'লে ? আমার সামনে বসে খাও মা, নইলে আমারো খাওয়া হবে না।"

"বাবা—মা খাননি—"

"তার মাথা ঘুরছে—একটু সরবৎ খেয়ে শুয়েছে তো ? খাওয়ার চেয়ে এখন ঘুমটাই তার পক্ষে বেশী দরকার, কিন্তু তুমি খেয়ে নাও মা, কি করবে ভেবে ? অদৃষ্ট ছাড়া আর গতি নেই। মুখ বুজে সহ্য করা ছাড়া আর উপায় নেই, এখন খেতে বোস। ওরে কে আছিস ? বৌমাকে আসন এনে দে—" একজন ঝি একটা আসন নিয়ে এলো।—শ্বশুর বললেন "ঠাকুরকে বল বিন্দু, বৌমার খাবার দিয়ে যাবে।" মৃদু আপত্তি তুলে লতিকা বললো—"বাবা ! এখন থাক্, আপনার পাতেই বসে পড়বো এখন—।" শৈলেশ্বরবাবু আর কিছু বললেন না, বধূর প্রতি সমবেদনায় ও আত্মগ্লানিতে মনটা তাঁর ভ'রে গেল।

লতিকা খেতে পারলো না। শ্বশুরের কথায় শুধু পাতে মাত্র ব'সে উঠে গেল। নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে শুনলো শাশুড়ী বলছেন—"ক্ষমা, বৌমা ছেলে মানুষ—একলাটী থাকবে, রাত্রে ঐ ঘরেই থাকিস বাছা !"

৭

অনেকে চেষ্টা ক'রেও নরেশকে ছাড়ানো গেল না। জামিনে সে বাড়ী আসতে চাইল না, বা বিচারের সময় কোন জবাবও দিতে স্বীকৃত হ'ল না। সে সময়ে শৈলেশ্বরবাবু রোজ আনাগোনা ক'রে চার পাঁচ জ'ন উকীল ব্যারিষ্টার দৌড়াদৌড়ি ক'রেও কিছু হ'ল না।

সত্যবালা ক'দিনে অনেকটা সামলে উঠেছেন। তিনি প্রায় রোজই ছেলের কাছে জানাতেন অনুরোধ, অনুযোগ, কাকুতি, মায়ের দাবী এবং আদেশ। কিন্তু নরেশ সবই শ্রদ্ধার সঙ্গে ফিরিয়ে দিয়ে বল্লো "সকলের বড় আমার যে মা, যাকে আমি ভালবাসি সবার চেয়ে, সেই মায়ের চোখের জল, আদেশ আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে আমার কর্ত্তব্যের পথে। মাকে বলবেন, আমাকে ক্ষমা করতে, আমি ফিরতে পারবো না। জীবন আমি উৎসর্গ ক'রে দিয়েছি এই মায়ের পায়ে। ও মায়ের জন্ম সুরেশ রইল।"

এই কথা শুনে সত্যবালা কঠিন হ'য়ে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন, তারপরে বললেন "ছেলে কঠিন হ'ল, তা হোক্, কিন্তু মা কঠিন হ'তে পারে না, বলো গিয়ে যে আমার কোলের দাবী সবার আগে নরেশেরই রইল।"

আর লতিকা সে শুধু অন্তরে গুমরে ম'রে দেখছিল শুনছিল সব, আর অধীর আগ্রহে, উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছিল শেষ

বিচারের রায় শুনবার জন্য। সে দেখছিল কেমন ক'রে মায়ের আকুতি ব্যর্থ হ'য়ে ফিরে আসছিল, সন্তানের দুর্দ্দমনীয় সঙ্কল্পের কঠিন বর্ম্মে নিষ্ফল আঘাত ক'রে। সে এর উপর আর কোন আবেদন জানায়নি স্বামীকে লেখায় বা কথায়। কি হবে? সে ভাবলো মায়ের মর্য্যাদা রাখলো না যে সন্তান, তার কাছে সে কোন ভাষায় কি নিবেদন জানাবে? আরো যখন সে তার সঙ্গে সব সম্পর্ক অস্বীকার ক'রে তার সম্বন্ধে শেষ নিষ্পত্তি ক'রে তাকে দূরে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে অপ্রয়োজনীয় বোধে। অভিমানের ব্যথা তার সব অন্তরের কামনাকে দমিয়ে দিয়ে চেপে বসলো, তার সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে। কাজ কি? থাক্— সে পারে তো নিজে উপযুক্ত হ'য়ে দেখিয়ে দেবে তার নির্দ্দয় অবিচারককে তার শক্তি কতখানি, তার তেজ কত দীপ্ত, আর না পারে নিজের লজ্জা অপমান নিয়ে, সে তার এ অনাবশ্যক জীবনটাকে পৃথিবীর বুক থেকে একেবারে সরিয়ে ফেলে দেবে। মনে পড়ে বিয়ের দিনের কথা, স্বামীর অনাবশ্যক রাগ, বিরক্তি— কেন? দেশের সেবায় শুধু সেবকের প্রয়োজন আছে—আর সেবিকার প্রয়োজন কি নেই? সে তো বিলাসিতা জানে না। ঔদ্ধত্য জানে না, সে কি পারতোনা তাকে তার মন্ত্রে দীক্ষিত করতে? তবে কেন সে তাকে দূরে ঠেলে দিল অবজ্ঞাভরে? এটুকু সামর্থ্য তার ছিল না, নিজের ধর্ম্মসঙ্গিনীকে তার কর্ম্মসঙ্গিনী ক'রে নেবার? এ কি দুর্ব্বলতা? একটা নারীর মোহপাশে প'ড়ে সে নিজের কর্ত্তব্য ভুলে যাবে এই ভয়েই বুঝি তাকে অস্বীকার ক'রে তার কাছ থেকে দূরে স'রে গেল সে? অথবা আরো অন্য কিছু?

লতিকা বুক বেঁধে স্থির হ'য়ে রইল—তাই যেদিন বিচার শেষে যখন নরেশের ছ'মাস জেলের হুকুম হ'ল, সেদিন সে বেশ অটল ভাবেই খবরটা শুনলো। মা সত্যবালাও শুনে একটা কম্পিত দীর্ঘ নিশ্বাসে বুকের বোঝাটা অনেকটা হাল্কা ক'রে নিয়ে সুরেশকে কোলের কাছে ঠেনে নিলেন! আর বাপ শৈলেশ্বর বাবু কয়েকদিন পাশা খেলা বন্ধ রেখে অন্দরেই কাটিয়ে দিলেন। তিনি সমস্ত বাড়ীর ঝি চাকর কর্ম্মচারী সকলকে নরেশের কথা গিন্নি ও বৌয়ের সামনে বলতে বারণ ক'রে দিয়ে নিজেই উঠতে বসতে সব সময়ে ধরা গলায় নরেশের নাম নিতেন। এক একদিন নরেশের কথা বলতে বলতে তাঁর স্বর বন্ধ হ'য়ে যেতো, চোখের পাতা ভিজে আসতো। আবার, নিজেকে নিজেই সান্ত্বনা দিয়ে বলতেন, "তা তুমি তো বোঝ না গিন্নি, রাত দিনই বৌমার সামনে নরেশের নাম করছ,—ছেলে মানুষ ওর মনে কত কষ্ট হয়! আরো জানো— এই বিনয় বাবু বলছিলেন, এ সময়টা ওর জেলে থাকাই ভাল! তবু ছ'মাস পরে প্রাণটা নিয়ে ফিরে আসবে—আর বাড়ীতে থাকলে আটকাতে তো পারতে না তোমরা, কোথায় গিয়ে আবার মাথা গরম ক'রে হাঙ্গামা বাধাতো শেষে প্রাণ নিয়ে টানাটানি করতে হ'ত। এ বরং এক রকম ভালোই হয়েছে। ছ'মাস চুপচাপ বসে থাকলে একটু শুধরে যেতে পারে।" দিনের ভিতর অন্ততঃ পাঁচ সাত বার এই যুক্তিটা তিনি ঘুরে ফিরে দিতেন, বলতেন—"যা করেন ভগবান মঙ্গলের জন্যই—"

সত্যবালা স্বামীর দিকে চেয়ে বলেন "তবে জেলে থাবার

যাবার বড্ড কষ্ট হয়, দেখোনা তোমার চেনা কাউকে দিয়ে যদি সে সুবিধেটুকু ক'রে দিতে পার।"

শৈলেশ্বর বাবু সোৎসাহে বলেন—"আমি কি তা না করেই চুপ করে আছি? সে বন্দোবস্ত আগেই করেছি। খাটতে হ'বেনা কারণ R. I. তো নয়। A class এ থাকবে, তা ছ'মাসও হতোনা, অনেক আগে থেকে তাকে ধ'রবার ছুঁতো খুঁজছিল কিনা তারা, তা তার জন্যও নয়, এ মিটিংটা করতে পুলিশ থেকে বারণ করে দিয়েছিল তা ছেলেত শুনলো না, জোর ক'রে মিটিং করে—" এই রকম অনেক কথাই তিনি ব'লে যেতেন নিজের মনে। নরেশকে শাস্তি থেকে অব্যাহতি দিতে পারা গেলনা ব'লে যেন তাঁরই কত ত্রুটী, নরেশ জেলে গেল বলে যেন তিনি কত অপরাধী স্ত্রীর কাছে, বধূর কাছে।

সেদিন লতিকা খাবার পর দুপুর বেলা ঘরে একটী সেলাই হাতে নিয়ে বসেছিল, এমন সময় সুরেশ ঘরে ঢুকলো। লতিকা প্রথমে পায়ের শব্দ পায়নি, হঠাৎ সুরেশ ধপ করে একটা বই ফেলে দিতেই লতিকা চমকে মুখ ফিরিয়ে বললো—"উঃ বাবা ঠাকুরপো এমনি ক'রে চমকাতে হয় বুঝি? দেখতো আঙুলে ছুঁচ ফুটে গেল।"

সুরেশ হেসে একটা পৌটলা খাটের উপর ফেলে দিয়ে বললো—"এই নাও খদ্দর। এর চেয়ে পাতলা আর পাওয়া যায়না—যা ঘুরিয়েছ সারাদিন!" লতিকা সেলাইটী রেখে কাগজের মোড়কটা তাড়াতাড়ি খুলে, কাপড়খানা উল্টে পাল্টে দেখতে দেখতে বললো "তা মন্দ হবে না,—তুমি আজ কলেজ যাওনি?"

সে হেসে চোখ ঘুরিয়ে বললো "ইস্ বড্ড মুরুব্বির মত জিজ্ঞেস করছ দেখছি, যাবো কি করে? তুমি যে বললে কাপড় আজই চাই!"

"তা আমি কি বলেছি যে কলেজ কামাই করে এনে দাও? মা শুনলে বিরক্ত হবেন।"

"না, মা কিছু বলবেন না—তবে বাবা—"

"তবে বোস না ভাই, একটু গল্প করি। কিছু খাবে?"

"নাঃ এইতো দশটায় খেয়েছি," ব'লে সুরেশ খাটের একপাশে ব'সে পড়লো। নিজে যখন লতিকা স্বামীকে জান্‌বার বুঝবার অবসর পেলোনা, তখন তার স্বামীর অনেক কথাই সুরেশেব কাছ থেকে জেনে নেবার ইচ্ছে হচ্ছিল—গল্পচ্ছলে। সুরেশ বললো—"কি গল্প?" লতিকা সেলাইটা আবার হাতে তুলে নিয়ে বললো—"তোমার যা খুসী—এই তোমাদের,—তোমার ছেলেবেলার গল্পই বলনা শুনি।"

"তোমায়ও বলতে হবে, কিন্তু—"

"নিশ্চয়, বলবো বই কি! আচ্ছা ছেলেবেলায় তুমি খুব দুষ্টু ছিলে—না?"

সুরেশ আশ্চর্য্য হ'য়ে বললো—"কে বললো, দাদা বুঝি?"

লতিকা মৃদু হেসে বললো—"নাঃ, তবে আমার মনে হয়—"

"হ্যাঁ বৌদি! তাই ছিলুম; আর দাদার কাছে রোজ কানমলা খেতুম, দাদা এতো মারতেন আমাকে—"

"নিশ্চয় তুমি ভয়ানক বিরক্ত কবতে, নইলে শুধু শুধু মারবেন কেন?"

"তা বিরক্ত করতুম বোধ হয়—কিন্তু অত মারবার মত

কি? তিনি বেম চট্ করে, খুব বেশী রেগে উঠতেন। তাঁর একটা কিছু জিনিষ ছুঁলেই আর রক্ষে ছিল না। একদিন দাদার নতুন চিরুণীটা দিয়ে লুকিয়ে চুল আঁচড়ে, ময়লা শুদ্ধ রেখে দিয়ে আমিতো খেলতে গেছি; একটু পরেই দাদা বাইরে থেকে এসেই আমাকে ডাকলেন, অমনি ভয়ে আমার বুক কাঁপতে লাগলো,—আবার মনে মনেও ভাবছি, তা দোষ তো করিনি কিছু, চিরুণী-টায় চুল আঁচড়ানো, তা আর কে দেখেছে? ভয়ে ভয়ে দাদার ঘরে গিয়ে দাঁড়ালুম যেই, অমনি দাদা রুদ্রমূর্ত্তিতে ঠাস্ ঠাস্ করে গালে দুটো চড় বসিয়ে বললেন 'পাজি! দুষ্টু! আমার ঘরে এসে জিনিষ পত্র ঘাঁটা হয়—আর করবি কখনো? এ চিরুণীতে অত ময়লা লাগিয়েছিস কেন?"

লতিকা বললো—"বেচারী ঠাকুরপো! আর তুমি?"

"আমি? আমি তখন ভ্যাঁ—" বলে সুরেশ কান্নার ভঙ্গি ক'রে দেখালো—

"তা শুধু ঐটুকুর জন্য অত ক'রে মারলে? ছি! কি অন্যায়।"

সুরেশ হাসতে হাসতে বললো—"ঐটুকু বুঝি? তখন তো বুঝিনি যে একরাশ ধূলো বালি মাথায় নিয়ে তার ওপরে তেল মেখে জল ঢাললে সে মাথার কি অবস্থা হয়,—আর ঐ সমস্ত ধূলো বালি সব দাদার চিরুণীতে"—সুরেশ হাসতে লাগলো, লতিকাও হেসে বললো—"তারপর? আর আদর করলোনা?

ঘাড় নেড়ে সুরেশ বললো—"হুঁ—কিন্তু সে অনেক পরে,—আমাকে ডেকে চিরুণীটা দিয়ে বল্লেন—"এই নে, যা তুই এটা নিয়ে যা, এ দিয়ে চুল আঁচড়াতে আমার ঘেন্না করছে। সেই জন্য তো দাদাকে ভয় করতুম যেমন, ভালও বাসতুম তেমনি—"

"তা এমনি ক'রে বুঝি প্রায় মার খেতে ?"

হেসে সুরেশ উত্তর দিল—"হুঁ—প্রায়—"

"আর তারপরেই আদর পেতে ?"

"হুঁ—কিন্তু মাঝে মাঝে পেতুম না—"

"কেন ?"

"সে আর একদিন, কি যে আমায় ভূতে ধরলো,—ঘুঁড়ির মাজন রাখতে আর কাগজ খুঁজে না পেয়ে, দাদার ঘর থেকে মেজের ওপোর ছড়ানো কতগুলো কাগজ নিয়ে এসে, আমি তো বেশ ক'রে কয়েকটা একসঙ্গে ক'রে, মাজন মুড়ে রেখে দিলুম, আর কতগুলো ছিঁড়ে কুঁড়ে কোথায় ফেলে দিলুম তার পরে ঠিক আমারি ডাক পড়লো—ভয়ে তো আমার আদ্ধেক প্রাণ উড়েই গেল—"

"তারপর—?"

"তারপর আর কি ? উঃ সেদিন কয়েকটা চড় যা দিয়েছিলেন, একেবারে বিষম, পিঠেও কয়েক ঘা পড়েছিল, তারপরে মাজন টাজন ফেলে দিয়ে কাগজ গুলো নিয়ে গেলেন। আবার যে গুলো ছিঁড়ে ফেলেছিলুম, তারজন্য কোণে দাঁড় করিয়ে রাখলেন একঘণ্টা, আর দুশো লাইন টাস্ক লেখালেন 'আর কখনো দাদার কাগজ নেবোনা' এই বলে। উঃ কি দুর্দ্দশাই হয়েছিল সেবারে—"

"সে গুলো কি কাগজ ছিল ?"

"কি জানি, দাদা বল্লেন কলেজের নোট্স্—"

"তা সেবারে আর আদর পেলে না—বুঝি—?"

"নাঃ সেজন্য মনটা অনেকদিন খারাপ হ'য়ে ছিল।"

"আহা! আমি তখন থাকলে ঠাকুর পো, কখনো মারতে দিতুম না।"

"সত্যি বৌদি! তুমি থাকলে বেশ হ'ত।"

"দাদা কিন্তু আগে কক্ষনো খদ্দর পরতেন না। আর ভয়ানক সৌখীন ছিলেন. মিহি পরিষ্কার কাপড় না হ'লে রেগে উঠতেন, মাথার টেরিটী সর্ব্বদা পরিপাটী থাকতে হবে। দামী সেণ্ট সাবান না হলে বাজে সেণ্ট সাবান কখনো ছুঁতেন না। দাদার সেণ্ট চুরী ক'রে আমি তো প্রায় মাখতুম, একদিন হঠাৎ ধরা—"

"তারপরে মার—"

"তাই আমি ভেবেছিলুম, আজ আর রক্ষে নেই, কিন্তু আশ্চর্য্য, সেদিন কিছুই করলেন না, শুধু বললেন মাখিস তো মাখ, কিন্তু দেখিস ফেলিস না যেন, ওর দাম কত জানিস?" আমি পরম আপ্যায়িত হ'য়ে বললুম, 'না দাদা,' তিনি বল্লেন 'ওটার দাম অনেক, তুই বুঝবি না, যা খেল্ গে—"

"তা'হলে দয়ামায়াও ছিল?"

"হ্যাঁ ছিল তো। কিন্তু আর এক দিনের কথা মনে হ'লে আমার দাদার ওপোর এখনো রাগ হয়, আর তার কারণও কিছু খুঁজে পাই না—"

"কি?"

"তখন বিনীতারা আমাদের বাড়ীতে খুব আসতো—

মুখ তুলে লতিকা জিজ্ঞেস করলো—

"বিনীতা আবার কে?"

"সে বিশ্বপতি বাবুর মেয়ে—তা দাদা তখন—"

"বিশ্বপতি বাবু কে?"

"তিনি ঐ পাশের বাড়ীটা ভাড়া নিয়ে ছিলেন বছর খানেক, —তা দাদা তখন—"

"বিনীতা এখানে খুব আসতো? কত বড় সে?—কেমন?"

সুরেশ একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বললো—"তা আমার গল্প শুনছোনা, শুধু প্রশ্নই করে যাচ্ছতো বলবো কি ক'রে?"

লতিকা হেসে বললো—"আচ্ছা! আচ্ছা! বল আমি এই চুপ করলুম—"

"না বলবো না যাও—!"

"লক্ষ্মিটী বল ভাই—।"

সুরেশ একটু চুপ ক'রে থেকে বললো—"দাদা তখন বি-এস-সি পড়ছেন। বিনীতার দাদা শচীপতি ও দাদার সঙ্গে এক, ক্লাসে পড়ছিল। শচীদার সঙ্গে দাদার খুব ভাব ছিল, আর বিনীতার সঙ্গেও দাদার বেশ ভাব ছিল।" লতিকা সাশ্চর্য্যে সেলাই বন্ধ ক'রে মুখ তুলে চাইল। সুরেশ থেমে বললো "কি —প্রশ্ন করবে না কি?"

লতিকা একটু লজ্জিত হ'য়ে বললো—"না—বল—"

সুরেশ বলতে লাগলো—"বিনীতার আবার ছোট একটী ভাই ছিল—তার নাম রতিপতি, সে প্রায় আমারি বয়সী, তার সঙ্গে আমার বেশ ভাব হ'য়ে গেল। কি মজাটাই করতুম। রতুর মা বড্ড ভাল বাসতেন আমাদের, রাতদিন খাওয়াতেন—"

"কি তারপরে, বলই না ছাই—"

হেসে সুরেশ বললো—"বলছি তো, রতুর মাকে আমরা মাসিমা ব'লে ডাকতুম, তিনিও আসতেন—"

লতিকার জিভে অসংখ্য প্রশ্ন এসে জমা হ'য়ে উঠলো—সে বললো "আঃ"—সুরেশ বললো—"বৌদি, তুমি এতো অস্থির—শোন, আমি রোজ রোজ যেতুম ওদের ওখানে আর রতুও আসতো, একদিন যেমন রোজ যাই তেমনি গেছি, আর কোন কথা বার্ত্তা নেই, দাদা ডেকে এমন মারলেন আর শাস্তি দিলেন যে মা শেষকালে এসে তবে ছাড়িয়ে নিয়ে গেলেন—"

আশ্চর্য্য হয়ে লতিকা বললো "কেন ?"

"তা জানবো কেমন ক'রে আজও তো জানি না; দাদা বলেছিলেন মনে আছে—'হ্যাংলার মত সব সময়ে ও বাড়ী যাওয়া হয় কেন ? ফের যাবি তো মেরেই ফেলবো। আবার ৫।৭ দিন পরে যেই কে সেই, আবার যেতে লাগলুম তখন আর দাদা কিছুই বলতেন না। কি অদ্ভুত !"

লতিকা জিজ্ঞেস করলো—"এঁরা কোত্থেকে এসেছিলেন ?"

"এঁরা কোথাকার নাকি জমিদার। এসেছিলেন মাসিমার চিকিৎসার জন্য—"

"একবছর ছিলেন ?"

"হুঁ—"

"তখন থেকেই যাওয়া আসা চলতো ?"

"হুঁ—ওরা আসবার দিন চার পাঁচেক পরেই বিশ্বপতি বাবু মানে মেসোমশাই এসে বাবার সঙ্গে আলাপ ক'রে গেলেন, তারপরে একদিন মাসিমার সঙ্গে দেখা করতে মা গেলেন—তারপরে আর কি—"

"তা ও বিনীতার কথা যে বললে, সে কত বড় ছিল ?"

"সে বেশ বড় ছিল, শুনেছিলুম তখনই তার বয়স ষোল

ছিল। আমি কিন্তু দুটী চ'ক্ষে দেখতে পারতুম না তাকে। দিদি বলতে হ'ত মা বলতে বলতেন, কিন্তু আমার ইচ্ছে হ'ত না।"

"সে দেখতে কেমন ছিল ঠাকুর পো ?"

"দেখতে তোমার মত সুন্দর মোটেই নয়, রংটা ফর্সা ছিল বটে, কিন্তু মোটা ছিল, নাক মুখ চোখও তোমার মত নয়।"

"তুমি দেখতে পারতে না কেন, কি করতো সে ?"

"কি করতো ? অত বড় মেয়ে এমন দুরন্ত হ'তে পারে তা জানতুমনা, এখন মাঝে মাঝে ভাবি কে যে ওর নাম 'বিনীতা' রেখেছিল। দুমদাম ক'রে পা ফেলে সে আসতো, এসে কি আর চুপ ক'রে বসবার নাম আছে ? ক্ষণে মায়ের কাছে গিয়ে তাঁর আঁচল টেনে খাবার চেয়ে খেয়ে অস্থির ক'রে তুলতো, তারপরে আমাদের কাছে এসে রতু আর আমার সঙ্গে লুটোপুটি ক'রে আমাদের নাটাই ভেঙ্গে ঘুড়ি ছিঁড়ে উৎপাত করে দৌড়ে চলে যেতো দাদার ঘরে, সেখানে দাদার বই ঘেঁটে কাগজ ছিঁড়ে, এটা ভেঙ্গে, ওটা ফেলে ঝড়ের মত আবার চলে যেতো। এমন অশান্ত মেয়ে কক্ষনো দেখিনি, ছেলেরাও বোধ হয় অমন হয় না। আর কি আহ্লাদে কথা। রাতদিন তার মাকে আবদার ক'রে ক'রে তো উত্যক্ত ক'রে তুলতোই,—আর মেসোমশাইর তো কথাই নেই, সে ছিল তাঁর চোখের মণি।"

লতিকা অবাক হয়ে শুনছিল। বললো "এহেন, মানুষটীকে দেখতে পেলুম না আমি। তা ও যে কাগজ পত্র ঘাঁটতো উনি কিছু বলতেন না ?

"কিচ্ছু না—দাদার সামনেই তো ঘাঁটতো—।"

লতিকার ভ্রূ দুটী কুঞ্চিত হয়ে এলো—"চলে গেলেন কেন ?"

মাসিমার অসুখ সেরে যেতেই চলে গেলেন, দেশে কাজকর্ম্ম আছে ব'লে।"

"তা চিঠি পত্র দেন নাকি ওঁরা কেউ?"

"তা জানি নে তো। দাদার কাছে শচীদা হয়তো দেন: আমাকে কিন্তু রত্নু কখনো চিঠি লেখেনি, আমিও লিখিনি। শুনেছিলুম শচীদা বি,এস্, সি, পরীক্ষা পাশ ক'রে, আর পড়েননি বিয়ে টিয়ে ক'রে নাকি দেশেই কাজ-কর্ম্ম দেখছেন।—"

লতিকার মনে একটুখানি মেঘ দেখা দিল। সে জিজ্ঞেস করলো "বিনীতার বিয়ে হয়নি?"

"হয়ে গেছে বোধ হয়, তখনি শুনতুম মাঝে মাঝে দাদা ক্ষ্যাপাতেন 'অমিয়র অমিয়া তুমি এই সব বলে' অমিয় না কে তারই সঙ্গে নাকি তার বিয়ে হবে বলে ঠিক হয়েছিল। সে তখন বিলেতে পড়ছিল।

"সে পড়তো না?"

সুরেশ হেসে বললো "পড়তো কিনা জানি না। তবে লেখা পড়া জানতো বেশ। দাদার সঙ্গে মাঝে মাঝে সেকস্‌পীয়ার, রবীন্দ্রনাথ পড়তো। আর অনেক কিছু আলোচনাও করতো। এত প্রশ্ন করতে পার বৌদি, তুমি ব্যারিষ্টার হও গিয়ে বেশ জেরা করতে পারবে। আজ অনেক গল্প করা গেল। তুমি শেলাই কর, আমাদের ফুটবলের সময় হয়ে এলো—"

লতিকা জোর ক'রে হেসে বললো—"বেশ ভাল লাগলো ভাই! প্রত্যেক রবিবার দুপুরে এসো গল্প করবো—কেমন?"

"হুঁ—" ব'লে সুরেশ গুণ গুণ ক'রে গান গাইতে গাইতে চলে গেল!

লতিকার শুভ্র কপালে মুক্তার মত বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠলো,—হাতের সূঁচ হাতে নিয়ে সে স্তম্ভিত হ'য়ে চুপ ক'রে বসে রইল।—

একদিন শাশুড়ী বধূকে ডেকে বললেন—"দেখো বৌমা, খদ্দর পরছো পর। কিন্তু বাড়াবাড়ি কিছু করোনা বাছা! এর পরে যদি সুরেশও মেতে ওঠে, তা'হলে আমার সংসার করা ফুরিয়ে যাবে।"

লতিকা কোন উত্তর দিল না; শুধু ঘাড় নেড়ে "আচ্ছা" বলে ধীরে ধীরে সেখান থেকে সরে যাচ্ছিল, শাশুড়ী আবার ডেকে বললেন—"শোন মা সারাদিন চুপ করে বসে থাক, তার চেয়ে একটী শিক্ষয়িত্রী রেখে দি, গান বাজনা আর একটু বেশী লেখাপড়া শেখাবে—তাহলে অত চিন্তা ভাবনাও মনকে অস্থির ক'রে তুলবে না, কেমন? আমি জানি একজন বেশ ভাল ঘরের মেয়ে আছেন। এখন অবস্থা খারাপ হয়েছে তাই কাজ চাইছেন। বিধবা, গান বাজনা, শেলাই ইংরিজি সবই একটু একটু জানেন—কি বল?" লতিকা নির্ব্বিকার ভাবে বললো "সে বেশ হবে মা!"

লতিকার মনে এতদিন আর কোন চিন্তাই স্থান পায়নি। সে শুধু গম্ভীর হয়ে এই অদৃষ্টা বিনীতা তার জীবন অঙ্কে কোন অংশ অভিনয় ক'রে গেছে সেই কথাই ভাবছিল। সে এতদিন একথা শোনেনি জানেনি! মনে পড়লো, বিয়ের পরে দাদাদের কথা, বাপের কথা—। দু'একটা ছিটে ফোঁটা ছিটকে তার কাণে এসে পড়েছিল বুঝি, তারই ফলে বাপের কপাল কুঁচকে এসেছিল। দাদারা নাক সিঁটকে ছিল—স্বদেশী হ'য়ে

তাতে ঘৃণা করবার কিছু থাকে না তো—তবে কি তাদের সে বিরক্তির কারণ এই ছিল? আর সেই জন্য কি পিসিমাও তাকে মুখ বুজে সব সহ্য করতে ব'লে সীতা সাবিত্রীর উপাখ্যান শুনিয়েছিলেন অবিশ্রান্ত ভাবে? স্বামী স্বদেশী হ'লে সীতা সাবিত্রী হওয়ায় কোন বাধা থাকে না তো—কিন্তু এ কি কথা? এ দিকটা তো সে ভেবে দেখেনি কোনদিন! বিয়ের দিন স্বামীর অস্বাভাবিক আচরণ দেশের জন্য কি ক'রে হ'তে পারে, এবং তার সমস্ত বিরক্তি সমস্ত ঔদ্ধত্য তাহলে গর্জ্জন করে উঠেছিল, এই বিনীতাকেই লক্ষ্য ক'রে এ কথা তো সে এতদিন ভেবে দেখেনি। কি সম্পর্ক ছিল তার এর সঙ্গে এ কথা তাকে কে ব'লে দেবে? কে বলে দেবে স্বামী তার শুষ্ক, রসহীন, ত্যাগী দেশভক্ত সন্ন্যাসী,—না সরস, চিরজাগন্ত বসন্তের কুঞ্জ-বিহারী প্রেমিক? একি সমস্যামূলক সন্দেহ সুরেশ তার মনে জাগিয়ে দিয়ে গেল খেলাচ্ছলে?

লতিকার ভারাক্রান্ত দিনগুলি কেটে যাচ্ছিল কোন রকমে—। সন্দেহের দোদুল্যমান ছায়া তার মনের ভিতর জাগিয়ে তুলেছিল একখণ্ড কালো ঘন মেঘ। তার এ সমস্যার সমাধান কে ক'রে দেবে? সত্যি কিছু থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে। কিন্তু তাকে সে সত্যের সন্ধানটুকু কে দেবে? এমন কেউ নেই যাকে সে জিজ্ঞাসা ক'রেও নিজের মনের ব্যথা ভার লঘু ক'রে নেয়? সুরেশকে ভাল ক'রে কিছু বলাতো যায়না! সে মাঝে মাঝে হতাশ হয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখে! সে যে এতদিন নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে বসেছিল, সেই দিনের অপেক্ষায়, যেদিন স্বামী তার গরিমার মুকুট মাথায় পরে ফিরে

আসবে, আর সেও উপযুক্ত হ'য়ে নিজেকে তারই পাশে দাঁড় করিয়ে চেয়ে নেবে তার কাছ থেকে তার কর্ম্মভার! তবুও সে কি তার হবেনা? কিন্তু সেই সমস্ত আশা তার ভেঙ্গে দিয়ে, তার মুখের সামনে ফুটে উঠলো এ কি! নিরাশার ব্যঙ্গ ভরা ছবি যা তার সমস্ত কল্পনাকে বিদ্রূপ ক'রে তার কানে শত শত হাসির তীক্ষ্ণবাণ ছুঁড়ে মারলো? নিজেকে একেবারে উৎসর্গ করে দিলেও তো পাথরের গায়ে দাগ ফুটিয়ে তুলতে পারবেনা সে—। তার সমস্ত উদ্যম সব প্রচেষ্টা কি ব্যর্থ হবে? সারা জীবনটা কি তার এমনি নিষ্ফল হয়ে যাবে? শাশুড়ীর কথা মনে হয়, তাতে সে লজ্জায় সঙ্কোচে নিজেকে আরো অনেকখানি ছোট, নীচু করে দেখে। স্বামীকে বশ করার অপারগতায় শাশুড়ীর এ পুনঃ পুনঃ চেষ্টা, আর তারই জন্য এ বিপুল আয়োজন কেন? কিসের জন্য? তাকে নিজে হ'তে যোগ্যতা দিতে চাইলনা যে, যার মন হয়তো আর একটা মধুর স্মৃতির আবরণ রচনা ক'রে তারই আড়ালে ঘুমিয়ে পড়ছে সেই আবেশে মাতোয়ারা হ'য়ে—তাকে সে জাগিয়ে তুলবে কি তার রূপের আলো জ্বেলে—? কেন? কেন? সে কি এতই অনুপযুক্ত, তার নারীত্ব কি এতই হেলার জিনিষ? হোক্ সে স্বামী—তবু—তবু—

মাঝে মাঝে অব্যক্ত যন্ত্রণা তার সমস্ত চিন্তাশক্তি বিলোপ ক'রে দেয়, সে স্তব্ধ হ'য়ে বসে থাকে, স্থির দৃষ্টিতে বিশাল শূন্যতার দিকে চেয়ে—দিগ্ দিগন্তে ছড়িয়ে দিয়ে তার গভীর বেদনার অগ্নিময়ী জ্বালা—

৮

ঘরে গিয়ে লতিকার মনে হল সুরেশকে আব দুটো কথা জিজ্ঞাসা কবলে হ'ত ঐ বিনীতা সম্বন্ধে, অর্থাৎ সে কাকে দিয়ে বলে পাঠালে আছেই বা কোথায়—

কিন্তু কি হবে জিজ্ঞাসা করে...যে কথা জানবার জন্য তার প্রাণের ভেতর ব্যগ্রতা ব্যাকুলতা উদ্বেল হয়ে উঠেছে—তাই যদি না জান্‌তে পারে?

তার কারামুক্ত স্বামীকে আন্‌তে যাবাব জন্য বিনীতার এই যে অধীর আগ্রহ এটা কি? বিজয়ী বন্দীব সম্বর্দ্ধনা? দেশ সেবকের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন? বন্ধু প্রীতির আকর্ষণ? কিম্বা—কিম্বা—হয়তো—ভ্রান্তি হোক্—সন্দেহ হোক—শেষের দিকটা মনে আস্‌তেই লতিকাব বুকেব মাঝখানটা টন্ টন্ করে উঠল। উঃ! কিসের এ যন্ত্রণা? এ ব্যথা, এ ব্যাকুলতা কেন?—কেন?—

যে জিনিষ সে পায়নি, হয়তো পাবেও না কখনো, তা' যদি পরহস্তগত হয়েই থাকে—তাতে এমন কি ক্ষতি?

সেই দুঃখে—অবাধ্য লুব্ধ মন যদি তার মাথা খুঁড়ে মরতে যায়—সেটা মনের অন্যায় নয়কি? নরেশ তো সেদিন স্পষ্টই বলেছে "আমাকে আপন জন মনে করতে তোমাকে আমি বারণ করে দিয়েছি" তবু তখনও আশা ছিল—তার ধ্যানের দেবতার পাষাণ বুকের কোন গোপন গহন তলে অমৃতের উৎস কানায় কানায় ভরে ছল ছল করছে—এক-

দিন ভক্তের একনিষ্ঠ সাধনায় উদ্বেলিত হয়ে কোন ফাঁকে বেরিয়ে পড়বে হয়তো—তার সকল ব্যর্থতা সার্থক করে, বুক-ফাটা তৃষ্ণার শান্তি করে—

কিন্তু এখন ?—হায় !…দাতার ভাণ্ডার রিক্ত জেনে এ কাঙাল প্রাণ তার শূন্য ভিক্ষাপাত্র নিয়ে তারই দুয়ারে দাঁড়িয়েথাকে কোন্ আশায় ? সেই কবেকাব শোনা স্বামীর মুখের একটী স্বীকারোক্তি —একটু কেন—তোমাকে হয়তো অনেকখানিই ভালবাসি—এই টুকুর উপর নির্ভর করে ? কিন্তু নরেশ তো এ কথার সঙ্গে সঙ্গেই এও জানিয়েছিল—আর একজনকে সে লতিকার চেয়েও বেশী ভালবাসে—সে তার দেশ—অবোধ লতিকা তখন ভাবেনি, মনে কল্পনাও করেনি—স্বামীর সেই স্বদেশ প্রীতির সাথে একটী নারীরও যোগাযোগ আছে অচ্ছেদ্য ভাবে। তার মতই একজন সামান্য নগণ্যা নারী সম্পূর্ণ অনাত্মীয়া হলেও সে তাঁর আত্মাব আত্মীয়া! দুদিনের জন্য সে কোথায় সরে গিয়েছিল আবার এসেছে স্বামী-সুখ-বঞ্চিতা অভাগীর দুর্যোগ মুক্তির সম্ভাবনায় প্রসন্ন ভাগ্যগগনে অমঙ্গলময় ধূমকেতুরূপে। সে কেন এল ?—লতিকার অন্তরের ধনকে অন্তর করে দিতে—ওঃ বিনীতা! বিনীতা !—

এই অতি ক্ষুদ্র নম্র শব্দটুকুর মধ্যে একি ভীষণ কালকূটের ফণা ? লতিকার ভাঙ্গা বুকখানা এ তীব্র জ্বালায় যে জলে পুড়ে খাক্ হয়ে যাবে গো! সে যে বড় আশা করেছিল! এতদিন বিমুখ ইষ্টদেবের স্বর্ণ সিংহাসনখানি এই পৃথিবীর অনেক—অনেক উর্দ্ধে তুলে হৃদয়ের স্বতঃ উৎসারিত শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেম দিয়ে সে যে দেবতার মতই পূজা করেছে,—

সে সিংহাসন ধূলোমাটিতে নামিয়ে মানুষের মত তার দোষ-গুণের বিচার করতে হবে? না, সে পারবেনা, তার অতবড় গর্ব্ব অতখানি গৌরব ক্ষুণ্ণ করতে।

নারীত্বের লাঞ্ছনা অবমাননা লতিকা এতদিন তো সব মুখ বুজেই সহ্য করেছে কিন্তু আজ প্রেমাস্পদের এই অন্যানুরক্তির কল্পনা ও—ওঃ!—এ যে অসহ্য! অসহ্য!

তবু এখনো সংশয় আছে, সুরেশের এলোমেলো গল্প থেকে সে এই অপরিচিত সম্বন্ধে যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করেছে—তার মধ্যে এমন কিছু নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়নি যাতে করে—

—ওমা! বৌদি'মণি! এখনো শোওনি? আমি মনে করেছিলুম ঘুমিয়েছ—লতিকার জট পাকানো চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে গেল।

সে চমক্‌ভাঙা হয়ে বল্লে—তোমার কাজ সারা হল ক্ষমা? মেঝেয় পাতা বিছানাটা ঠিক্ করতে করতে ক্ষমা হাসিমুখে উত্তর দিল—হ্যাঁ, আজকের কাজ কি আর সারা হয় বৌদি'মণি! গিন্নিমার ফাই-ফরমাস শেষ হয়না কিছুতেই কেবল এটা কর্ ওটা কর্, তুমি একলা আছ বলেই আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। ক্ষেন্তী, কেষ্ট, ওরা কেউ ছুটী পায়নি এখনো। মা একেবারে আহ্লাদে আটখানা, ছেলের জন্যে যে কি করবেন কি না করবেন তা ভেবেই পান না! আহা! হবে না? মায়ের প্রাণ তো? ছেলে যাই হোক্ না কেন—

বাস্তবিক; মায়ের মত দরদী প্রাণ বুঝি আর কারো নেই? লতিকার চোখ দুটো ছল ছলিয়ে এলো, মনে পড়ল প্রথম বারে

বিয়ের কনে হয়ে সে যখন শ্বশুরবাড়ী আসে, তখন মা তার চোখের জল আঁচলে মুছিয়ে আদর করে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন—'এখন এত কাঁদছিস্ মা! কিন্তু এর পর যখন নিজের ঘরকন্না চিনবি, স্বামী কি বস্তু তা বুঝবি, তখন গরীব বাপ্ মা'র কাছে আস্তে ইচ্ছেই করবে না।—'

মায়ের সেই কল্যাণ কামনাভরা ভবিষ্যদ্বাণী—তার ভাগ্যে নিষ্ফল হয়ে গেল কেন?—কা'র অভিশাপে?—স্বামীর ঘর সংসাব হয়তো সে চিনেছে, চিন্‌বে ও,—কিন্তু স্বামীকে—হায়!

লতিকাকে নীবব দেখে ক্ষমা বল্লে—ঘুম পাচ্ছে বউদি!—আলোটা নিভিয়ে দেব?

—দাও—বলে লতিকা বিছানায শুয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুম কোথায়? দিনের কাজে—দিনের গোলমালে যে চিন্তা, যে ব্যথা সে জোর করে ঠেলে বাখ্‌তে পেরেছিল এখন নিভৃত কক্ষে—রাতের নিঝুম নীরবতায় সে গুলো এক সঙ্গে ভিড় করে এসে তা'র বুক চেপে ধরল। সকল চিন্তাকে ছাপিয়ে উঠল বিনীতা!—

ক্রমাগত এপাশ ওপাশ করতে দেখে ক্ষমা হাই তুলতে তুলতে বলে—ঘুম আসছে না বউদি,—

হ্যাঁ, আসছে বই কি! তুমি ঘুমোও ক্ষমা! তোমাকে আবার সকাল করে উঠতে হবে তো?

নীরবে গভীর একটা নিঃশ্বাস ফেলে লতিকা পাশ ফিরে শুলো। সাম্‌নে সেই পূবের জানালা, পাশের বাড়ীর জানালাটাও খোলা,—সঙ্কীর্ণ গলির ফাঁকে এক ঝলক্ জ্যোৎস্না এসে সেই জানালায় পড়েছে, আঁধার ঘরের কিয়দংশ আলো করে। ঘরের অধিবাসীরা সুষুপ্ত সাড়া শব্দ নেই কারো। কচি খোকাটীকে

বুকে নিয়ে, অন্তর্নিগূঢ় প্রীতি দিয়ে রচা সুখশয্যায়, দয়িতের প্রেমতপ্ত বাহু শিথানে শয়ন করে সেই মমতাময়ী বধূটী এতক্ষণ না জানি কি সুখের স্বপ্ন দেখ্‌ছে! সে স্বপ্নেও কি পরিতৃপ্তি! ওরা যে শান্তির রাজ্যের প্রাণী, তার মত শান্তিহারা সর্ব্বহারা নয় তো!

পথের ভিখারিণী রাজরাণীর সুসজ্জিত প্রাসাদের দিকে যে ভাবে তাকিয়ে থাকে, ঠিক্ তেমনি করে কাঙাল নয়নের ক্ষুব্ধ, লুব্ধ দৃষ্টি মেলে লতিকা সেই জ্যোৎস্নালোকিত বাতায়নের পানে চেয়ে রইল, চেয়ে, চেয়ে, তার এক সময় হঠাৎ মনে পড়ে গেল—সুরেশ বলছিল 'বিশ্বপতিবাবু পাশের বাড়ীখানা ভাড়া নিয়েছিলেন'—সে কি ঐ বাড়ী? হ্যাঁ, নিশ্চয় তাই। ঐ জানালাতেই হয়তো বিনীতাকে নরেশ প্রথম দেখেছিল, সাদা চোখে নয়, তরুণ যৌবনের মোহাঞ্জন চক্ষে দিয়ে, নইলে সে নারীর মধ্যে এমন কি বিশেষত্ব আছে—যাতে নরেশের মত একজন নির্লোভ নিস্পৃহ, জিতেন্দ্রিয় যুবকের চিত্ত জয় করতে পারে! রূপে, গুণে, কিছুতেই সে যে তা'র স্বামীর যোগ্য নয়,—তবু—একেই বলে ভালবাসা! প্রাণের ভেতর থেকে আসা,—পলে পলে বর্দ্ধিত, তিলে তিলে সঞ্চিত এই যে ভালবাসা, এতো সিঁদুর পরা দিয়ে, ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে জোর করে টেনে আনা নয়!

ঐ অতি কাছাকাছি দুটী জানালায়, তারা দুটীতে হয়তো মুখোমুখী হয়ে বসে থাকৃত,—মিলনাকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল 'চকা-' 'চকী'র মত,—কত নিদ্রাহারা নিশির অধীর মুহূর্ত্ত তাদের কেটে গেছে এই খানে, কত দেখার আনন্দ, অদেখার দীর্ঘশ্বাস ঝরে

পড়েছে ওই বাতায়নতলে। অমন এক আধ দিন তো নয়, একটী বছর—বারোটী মাস—সে অধিকার নিতে চায়—লতিকা? দুরাশা! দুরাশা! তার রূপ যতই মোহনীয় হোক্, প্রেম যত গভীর হোক্ সে লতিকা—বিনীতা হবে কি করে?

ঢন্ ঢন্ করে বড় ঘড়ীটাতে দুটো বাজল। লতিকার অবাধে ভেসে চল চিন্তা-স্রোত বাধা পেয়ে থম্‌কে গেল। জানলার দিক থেকে জোর করে দৃষ্টি ফিরিয়ে সে চোখদুটী বুজিয়ে নিলে এতক্ষণকার সত্যকে মিথ্যা; মিথ্যাকেই সত্য প্রতিপন্ন করবার ব্যর্থ চেষ্টায় ক্ষত বিক্ষত মনটাকে একটু বিশ্রাম দেবার আশায়, কিন্তু মনের কি বিশ্রাম আছে ছাই!

লতিকার মুদিত চোখের পাতা দুখানি ভারি হয়ে জড়িয়ে এলো, জাগরণের ক্লান্তিতে, সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্ন। সে যে কত কি—এলো মেলো, ধরতে গেলে খেই হারিয়ে যায়। তারই মধ্যে শুধু এইটুকু স্পষ্ট হয়ে ফুটল—যেন নরেশ এসেছে। তার হাসি হাসি মুখখানা কি সুন্দর!—কি জ্যোতির্ম্ময় প্রশান্ত চক্ষু-দুটী! সে চোখ দিয়ে প্রেম করুণা ঝরে পড়ছে শতধারে। স্বাভাবিক দেবকান্তি তা'র দীর্ঘ ছয় মাসের ব্যবধানে যেন আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

চারিদিকে জনারণ্য, গোলমাল। শত কণ্ঠের জয়ধ্বনি তাকে নন্দিত করছে। শাঁখ বাজ্‌ছে ঘন ঘন। হাজার হাজার বাহু উদ্যত হয়েছে দেশ-সেবকের কণ্ঠে জয়মাল্য দেবার জন্যে, কিন্তু সকলের আগ্রহ, সমস্ত আয়োজন উপেক্ষা করে নরেশ তা'র নির্জ্জন ঘরটিতে এসে দাঁড়াল—আঁধার ঘর আলো হয়ে উঠ্‌ল—তা'র অপরূপ রূপের ছটায়, সে যেন সত্যই দেবতা! কিন্তু

পাষাণ নয়, রক্তে মাংসে গড়া। লতিকা ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল—কোথায় মালা? কোথায় ফুল? তা'র যে কোনো আয়োজনই নেই! শূন্য-মন্দিরাগত অভীষ্ট দেবকে সে আজ সম্বর্দ্ধনা করবে কি দিয়ে? কি দিয়ে তার পূজার অর্ঘ সাজাবে?

আস্তে ব্যস্তে ফুলদানী থেকে গোটাকতক গোলাপ তুলে নিয়ে বেপথু চরণে, দুরু দুরু বক্ষে এগিয়ে চল্লো, কিন্তু পা যেন আর চলে না। চোখ দুটো যেন ঝাপ্সা হয়ে গেল অক্ষমতার কাতর অশ্রুজলে। তা'র সঙ্কোচ দেখে স্বামী নিজেই কাছে এলেন, অনাদৃতা উপেক্ষিতা পত্নীর মুখপানে চেয়ে—এমন কোমল, এত মধুর স্নেহাতুর দৃষ্টি সে চোখে লতিকা আর কোনো দিন দেখেনি, অমৃতবর্ষী কণ্ঠে প্রাণ গলানো অনুরাগ ঢেলে তিনি যেন হাস্তে হাস্তে বল্লেন—

লজ্জা কি লতিকা? কাছে এসো,—আমার ভুল ভ্রান্তি সব ক্ষমা করো তুমি। আমি এখন বুঝেছি 'প্রাণের দাবী সবার আগে। তোমাকে আমি ভালবাসি, সত্যিই ভালবাসি, সবার চেয়ে বেশী একথা স্বীকার করতে আজ আমার আর এতটুকু দ্বিধা এতটুকু কুণ্ঠা নেই—

পরম আশ্বাসে লতিকা তা'র চোখের জলে ভেজা বিরস ফুল ক'টিতে সাজানো অর্ঘখানি স্বামীর পায়ে দিতে গেল—আনত হয়ে, সেই সময় কে একটী তরুণী কি জানি কোত্থেকে এসে বিজয়ী বীরের শিরে গৌরব মুকুট পরিয়ে দিলে, মুকুট খানা আগা গোড়া শুভ্র শ্বেত শতদলে গড়া, গন্ধে তার ঘর ভরে গেছে।

লতিকার প্রসারিত হাত দু'খানি ফিরে এলো, তার এ তুচ্ছ

পূজার উপহার ঐ মুকুটধারী রাজ রাজ্যেশ্বরকে সে দেয় কেমন করে ?

ভয় নেই লতিকা !—এসো—বলে নরেশ তার দিকে হেঁট হতেই একটা মস্ত বড় পদ্মফুল মুকুট থেকে খসে পড়্‌ল। লতিকা কুণ্ঠিত, কম্পিত করে ফুলটী তুলে নিয়ে মুকুটে লাগাতে গেল, কিন্তু একি ? কিছুতেই লাগান যায় না যে ! যত হাত বাড়ায় নরেশের মাথাটা ততই উঁচু হয়ে যায় ! তার বিপন্ন অবস্থা দেখে নরেশ পার্শ্ববর্ত্তিনীর দিকে ইসারা করে বল্লে একে দাও—তুমি পারবে না লতিকা !

মেয়েটি ফুল নেবার জন্য মুখ ফেরাতেই লতিকা চকিত হয়ে দেখ্‌ল, এ যে বিনীতা !—ক্ষণদৃষ্টা বিনীতার মুখচ্ছবি লতিকার মনে তখনও আঁকা ছিল।

তার হাত থেকে পদ্মটা একরকম কেড়ে নিয়েই বিনীতা নরেশের মুকুটে পরিয়ে দিলে, তারপর তার হাত ধরে সে নিয়ে চল্লো কি জানি কোথায় ! দীন পূজারিণীর কত সাধের সাজানো প্রাণের অর্ঘ্য পায়ের তলায় দলিত পিষ্ট করে।

লতিকা ফেটে পড়া বুকখানা দুহাতে চেপে, সেইখানে লুটিয়ে পড়ল—যেওনা, যেওনা,—ফিরে এসো ! ওগো নিষ্ঠুর !—আমার, তৃষিত ক্ষুধিত বঞ্চিত চিত্ত এতদিন অনন্যমনা হয়ে যে শুধু তোমাকেই কামনা করেছে, তার দীর্ঘ ব্যাকুল প্রতীক্ষা সফল করতে তুমি এসো গো !

ও বউদি মণি ! কি হল ? অমন করছ কেন গা ?—

ক্ষমার ডাকে লতিকার ঘুম ভেঙ্গে গেল। দেখলে চোখের জলে বালিস ভিজে গেছে। তখন পূবের জানালায় ভোরের

শুকতারাটি বিদায় ব্যথায় ম্লান। ওমা! এরি মধ্যে রাত পোয়ালো! উঠি এবার, কত কাজ আজ—ক্ষমা বিছানা তুলে দুর্গা নাম করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আজ্‌কের দিন যে কি—তা মনে পড়তেই লতিকার দুঃস্বপ্ন-ভারাক্রান্ত অশান্ত চিত্ত অনেক খানি হাল্‌কা হয়ে গেল। এই ছ'মাস ব্যগ্র ব্যাকুল আগ্রহে সে যে এই দিনটীর অপেক্ষাই করেছে! আজ সেই প্রতীক্ষার শেষ—কিন্তু—স্বপ্নের ঘোর মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে সে বিছানা ছেড়ে জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। রাতের আঁধারে যে সব অপ্রিয় কষ্টকর চিন্তা মনের গোপন কোণ থেকে বেরিয়ে বিষধর সর্পের মত তাকে ছোবল্ দিয়েছে এখন ভোরের আলোয় চকিত হয়ে সে গুলো কোথায় লুকিয়ে গেল।

লতিকা ভাব্‌লে তার একি বিষম দুর্ব্বলতা! সে না প্রতিজ্ঞা করেছিল স্বামীর মত 'পাথর' হ'য়ে তা'র বিরাট সুখ দুঃখ, মহান্ কাজের ভাগ নিয়ে তা'র পাশে সগৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে—যথার্থ সহধর্ম্মিনী, সহকর্ম্মিনীরূপে—অন্তরের সমস্ত সুপ্ত শক্তি জাগ্রত করে, তা নয়, কোথাকার এক বিদ্‌ঘুটে ভাবনা, অনিশ্চিত সংশয় শঙ্কা মনে এনে খামখাই মনটাকে সঙ্কীর্ণ শক্তিহীন করে তুলছে। এমনও তো হতে পারে এই ছ'মাসের দীর্ঘ ব্যবধানে স্বামীর পরিবর্ত্তন ঘটেছে, পাষাণে রেখা পড়েছে—রূপ যেন তুচ্ছ—কিন্তু প্রেমের কি এতটুকু আকর্ষণী শক্তি নেই? না-ই থাক—স্বামীর ভালবাসা সে না-ই বা পেলে। এক মাত্র স্বামী-প্রেমেই কি নারী-জীবনের চরম সার্থকতা? স্বামীর প্রিয়তমা নর্ম্মসখী হওয়ার চেয়ে তাঁর ধর্ম্ম কর্ম্মের সঙ্গিনী, পুণ্যব্রতের অংশ ভাগিনী হওয়াই বাঞ্ছনীয় নয় কি?

এ প্রশ্নের উত্তরে পাশের বাড়ীর ঐ বউটী হয়তো শিউরে উঠ্‌বে, বল্‌বে—না, কখনো না! সে জীবন গৌরবের হতে পারে, সুখের নয়। স্বামীর যশঃ গরিমা, ত্যাগের মহিমা, তোমাকে মহীয়সী করতে পারে, অমর করতে পারে, কিন্তু তোমার বুভুক্ষা, প্রাণের কাঙালপনা তাতেই ঘুচ্‌বে কি? সে যদি তার প্রাপ্য না পেয়ে এক দিন বিদ্রোহী হয়ে মাথা তুলে দাঁড়ায় তখন পারবে কি তাকে ঠেকিয়ে রাখ্‌তে?

কিন্তু লতিকা আর ঐ বউটীতে অনেক তফাৎ আছে। সে যা অযাচিতে পেয়ে গেছে লতিকা তাই পাওয়ার সাধনা করছে, পাবে কি না তার নিশ্চয়তা নেই কিছু, এ দুইয়ে প্রভেদ বিস্তর। কাজেই লতিকা অবাধ্য মনকে চাবুক্ মেরে, দমে পড়া বুকখানা সগর্ব্বে ঠুকে আপন মনেই বল্লে কেন পারবেনা! পারবে, সব পারবে সে। যে নারীর প্রাণে এতটুকু দৃঢ়তা নেই তার নারীত্বের মর্য্যাদা···

রিন্ ঝিন্ করে শব্দ হল চাবির গোছার। লতিকা মুখ ফিরিয়ে দেখ্‌লে সেই বধূটী জান্‌লা বন্ধ করতে এসেছে বোধহয়। তা'র শ্লথ কেশ বেশ, মুখে চোখে ঘুমের আবেশ মাখানো। স্বামীর সোহাগ, সন্তানের মমতা, তার প্রতি অঙ্গে নন্দনের মাধুরী ফুটিয়ে তুলেছে। মুখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া এলোমেলো চুলগুলো সরাতে সরাতে সে লতিকাকেই দেখ্‌ছিল, অলস স্নিগ্ধ আঁখি দুটীতে কি আগ্রহ কি বিস্ময় তার! ও আজ যা দেখ্‌ছে তা যেন ওর ধারণার অতীত। লতিকার হাসি পেল, এতদিন পরে সে রাতারাতি এমন কি দর্শনীয় বস্তু হয়ে উঠ্‌ল যে ঐ স্বামী-পুত্র-সর্ব্বস্বা তরুণীরও মনোযোগ আকর্ষণ করেছে আজ?

হায় রে দুনিয়া!

* * * *

ঘর থেকে বেরোতেই লতিকার দেখা হল সুরেশের সাথে। সুরেশ হন্তদন্ত হয়ে সিঁড়ির দিকে যাচ্ছিল, লতিকাকে দেখে সরল সুন্দর মুখখানা স্নিগ্ধ হাসিতে ভরিয়ে সে বলে উঠল—সুপ্রভাত বউদি!

সুপ্রভাত! আজ যে এত ভোরেই—

আরে বলো কি? আজ কি আমার একটা কাজ? দাদাকে আনতে যাবার সব বন্দোবস্ত, সদরবাড়ী সাজানো সমস্ত ভারই তো আমার ওপরে—

লতিকা মৃদু হেসে বল্লে—ইঃ! তুমি ভারি তো কাজের লোক হয়ে উঠলে—ঠাকুরপো!—হ্যাঁ, বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে তোমার বিনীতাদির কথা? কি বল্লেন?—

কি আর বল্‌বেন? বল্লেন নিয়ে যেও স্বচ্ছন্দে।

লতিকার হাসিমুখ গম্ভীর হয়ে গেল। সে মুখের পানে আড়ে আড়ে তাকিয়ে সুরেশ সান্থুরোধে বল্লে—তুমিও চলো না বৌদি?—আচ্ছা, যেতে দোষ কি বলো?

দোষ তো নেই, কিন্তু দরকার কি ভাই? উনি যদি পছন্দ না করেন—

হ্যাঁঃ!—তোমার ঐ এক কথা!—দাদা পছন্দ করবেন কিনা, তুমি তা কি করে জান্‌লে?—এই তো বিনীতাদি যাচ্ছেন—

বিনীতাদির কথা আলাদা। তিনি তোমার দাদার বন্ধু!

আর তুমি? তুমি কিছু বুঝি নয়?—সুরেশ হা হা করে হেসে উঠ্‌ল।

ওঃ বুঝেছি তুমি তাই যাবে না!—বাস্তবিক তোমাদের মেয়ে জাতটা কি ভীষণ হিংসুটে বউদি?—বাপ্‌রে বাপ্‌!—

লতিকা তার অপ্রতিভ ভাবটা চাপা দেবার জন্যে শুক্‌নো মুখে জোর করে একটু হাসি এনে বল্লে—

হ্যাঁ তা বই কি?—আর তোমাদেব জাত সব পরমহংস—না?

বেশ বলেছ! আচ্ছা এসব তর্ক একদিন হবে, উপস্থিত তিলার্দ্ধ নাহি অবসর। যাই আগে মালীকে ফুলের জন্যে বলে আসি, 'কার'খানা খুব জম্‌কালো করে সাজিয়ে নিয়ে যাবো—

শুধু বাড়ীর 'কারে'ই হবে?

না, একখানা ট্যাক্সি ও করতে হবে, লোক যে বেশী যাচ্ছে, আমি বাবা, বিনয়বাবু তাছাড়া আরো—দাদার বন্ধু—খুড়ী!—বান্ধবীটীও আছেন তো?

লতিকার মুখপানে অর্থপূর্ণ সকৌতুক দৃষ্টি ফেলে সুরেশ হাস্‌তে হাসতে সিঁড়ি দিয়ে নাম্‌তে লাগ্‌ল। কয়েক ধাপ নেমেই সে আবার মুখ ফিরিয়ে বল্লে হ্যাঁ, দেখ বউদি! ফুলের তোড়া গুলো আমি মালীকে দিয়েই করে নেব, কিন্তু মালার 'চার্জ্জ' তোমাকে নিতে হবে ভাই, অন্ততঃ দাদার গলার মোটা 'গড়ে' গাছটা তোমার নিজের হাতেই গাঁথা চাই, বুঝ্‌লে? লতিকার বুকের ভেতর হাতুড়ীর ঘা পড়ল। চকিতে মনে পড়ে গেল স্বপ্নের কথা। ভোরের স্বপ্ন বাস্তবিক নিস্ফল হতে পারে নাকি?—নিজেকে কষ্টে সংযত করে সে সুরেশকে ডেকে বল্লে—ঠাকুরপো! শোনো,—

কি?

বান্ধবীটী তোমাদের সঙ্গে এখানে আসবেন না?—

দেখি, যদি আসেন। তোমার ভারি আগ্রহ হচ্ছে না? সারারাত ঘুম হয়নি বোধহয়।

সুরেশ হাসতে হাস্‌তে কথাটা বলেই তর তর করে নীচে নেমে গেল। সে আজ ভারি ব্যস্ত!—



ক্ষমা! নারকেল কোরা হ'ল? তাহলে এই কিস্‌মিস্‌ পেস্তা গুলো হাতা হাতি করে বেছে ফেলো দেখি!—এই গোকুল পিঠে গুলো ভাজা হলেই মিষ্টির পাট শেষ হয় একরকম। ও ঠাকুর! তুমি তো বেশ লোক! এখানে 'হাঁ' করে দাঁড়িয়ে আছ, ওদিকে পায়েস খানি 'ধরে' যায় যদি? এতটুকু লেগে গেলে কেউ মুখে দিতে পারবে না যে।—হ্যাঁগা বউ মা! তুমি এখনো উঠলে না! না বাছা! তোমাকে নিয়ে আর পারি না আমি। সেই কখন্‌ থেকে বলছি ওঠো—

লতিকা কুচোনো বাদাম গুলো জল থেকে রেকাবে তুলতে তুলতে সলজ্জ ভাবে বল্লে—যাচ্ছি মা! এত তাড়াতাড়ি কি? এখনো তো বেলা ঢের—

বেলা আর কই মা? চারটে বেজে গেছে হয়তো ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ওরা এসে পরবে, বলে দিয়েছি কোনমতে যেন দেরী না হয়। আহা! এক আধ দিন তো নয় ছ' মাস দেখিনি আমার বাছাকে, প্রাণটা এমন ছট্‌ ফট্‌ করছে।

পুত্রের অকল্যাণ আশঙ্কায় সজল চোখদুটো ত্রস্তে আঁচলে মুছে ফেলে বধুর হাত থেকে রেকাব খানা টেনে নিয়ে তিনি

বল্লেন যাও মা! যাও, এই বেলা চুল টুল বেঁধে কাপড় ছেড়ে নাওগে, এর পর গোলমালে—হ্যাঁ, তোমার গয়নার বাক্সর চাবিটা বুঝি আমার—

আবার গয়না কি হবে মা? এই গরমে—

—আচ্ছা থাক্ তাহলে, তোমার যা অভিরুচি—মোদ্দা দেরী করো না আর। আকাশের গতিক যেমন দেখছি, এর মধ্যে একটা ঝড় টর না উঠলে বাঁচি। কাল বৈশাখীর দিন—

লতিকা শাশুরীর আদেশ পালন করতে গেল।

সাজবার আগ্রহ তার মনে একটুকু ছিলনা এমন নয়, কিন্তু এই সরম সঙ্কোচ জড়িত সংশয়ের ভাব সে যে কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। গোপন পুলকরাগে রঙীন প্রাণখানি তার থেকে থেকে ঝাপ্‌সা হয়ে উঠ্‌ছিল তার দুর্ভাগ্যের কথা, স্বপ্নের কথা মনে করে। সে স্বপ্ন যদি সত্য হয়, যদি—যদি বিনীতা—দূর হোক্ ছাই স্বামীর কথা ভাব্‌তে গেলেই বিনীতা এসে পরে কেন? এটা কি উচিত! একজন অপরিচিতা ভদ্র মহিলার প্রতি এমন একটা বিদ্বেষ ভাব—খামখা! সুরেশ কি সাধে বলে হিংসুটে? বাস্তবিক মেয়ে পুরুষে বন্ধুতা হতে নেই নাকি। কিন্তু—

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচ্‌ড়াতে আঁচ্‌ড়াতে লতিকার একবার নয় বার বার মনে হ'ল সুরেশ অত করে সাধ্‌লে, শাশুড়ীও বলেছিলেন তবু সে গেল না,—গেলে ক্ষতি কি ছিল? তার তো স্বামী, বিনীতার পাশে তাকে দেখ্‌তে—বিশ্রী তো নয়ই, অশোভনও দেখাতো না বোধ হয়। বিনীতা তার চেয়ে বড় কিসে? বিদ্যায়?—গুণে?—হায়—একটা ব্যথায়·

তপ্তশ্বাস লতিকার মর্ম্ম মথিত করে বেরিয়ে এলো। বৃথা,—বৃথা এ গর্ব্ব,—ছাই রূপ তার। যে রূপের এতটুকু সম্মোহন শক্তি নেই, যে বিমুখ দয়িতকে বাঁধতে পারে না তার সার্থকতা কি? বিধাতা তাকে এত রূপ না দিয়ে যদি ভাগ্য দিতেন।

এমনি ভাবনার তন্ময়তার মধ্যে চুল বাঁধা শেষ করে সিঁথিতে সিঁদূব দিতেই লতিকার মনে পড়ে গেল তার পিসীমার সিঁদুর 'পড়া'র কথা। কাল কাপড় ছাড়বার সময় সে তাড়াতাড়িতে সেটা আঁচল থেকে খুলে মোড়ক সুদ্ধুই আরসীর নীচে গুঁজে রেখেছিল, কোটোয় ঢালা হয়নি। মোড়কটা খুলে লতিকা খানিক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার দেহ ভরা রূপ, বুকভরা প্রেম, সব নিষ্ফল ব্যর্থ হয়ে গেল এখন এই মন্ত্রপড়া সিঁদুর কপালে দিয়ে স্বামী বশ করতে হবে? কি লজ্জার কথা! নারীর এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য এর চেয়ে বেশী অপমান আর কি আছে?—কিন্তু পিসী-মা বলে দিয়েছেন এ অব্যর্থ। সুতরাং— মানুষের শক্তিতে যেখানে না কুলোয়, সেখানে দৈবের সহায়তা নিলেই বা?—তারপর—গুরুজনের আদেশ।

লতিকা আনমনে অনাগ্রহের ভাবে মোড়কের মধ্যে একটা আঙুল ডুবিয়ে একটুখানি সিঁদুর তুলে নিলে, কিন্তু আঙুলটা কপালে ঠেকাতেই তার ক্ষুব্ধ আহত নারীত্ব যেন ধিক্কারে ছিছি করে উঠল। ইচ্ছা হল টিপটা তখনি মুছে ফেলে নিশ্চিহ্ন করে, কিন্তু সিঁদুর মুছতে নেই যে!

লতিকা কাপড় ছেড়ে, ঘরের পরিপাটী করে সাজিয়ে রাখা জিনিষ গুলোয় আর একবার সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে টেবিলে রাখা স্বামীর কোটোখানা আর একবার আঁচল দিয়ে মুছে নীচে নেমে

গেল। তখন আকাশের কোথায় কি জানি বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছে। গোধূলির দীপ্ত লালিমা বিবর্ণ ধূসর হয়ে এসেছে।

বধূর সাজ-সজ্জা দেখে শাশুড়ী অবাক হয়ে গেলেন। তার পরণে সাদা খদ্দরের সেমিজ—খদ্দরের শাড়ী। শুভ্র শাড়ীর ধারে ধারে সবুজ পাড়খানি পবিত্রতার স্নিগ্ধ দীপ্তির মত,—তন্বীর সুগৌর, সুঠাম তনুখানি ঘিরে রেখেছে—কি মধুব ভাবে! পঞ্চমীর চাঁদের মত সুন্দর শুভ্র ছোট্ট কপালখানিতে সিঁদুরেব গাঢ় রক্তরাগ কি অপূর্ব্ব শ্রীই ফুটিয়ে তুলেছে! সুন্দর অপরূপ!

বধূর সে অপরূপ রূপ শাশুড়ীকে মুগ্ধ করলেও তিনি একটু খুঁৎ খুঁৎ করে বল্লেন—এ কি পোষাক হোল বউমা? তোমার অতগুলো ভাল কাপড় থাকতে—সেই যে ফিকে বেগুনী রংয়ের নতুন মাদ্রাজীখানা...লতিকা মুখ নীচু করে সলজ্জ অনুনয়ের সুরে বল্লে—থাক্‌, মা! এই কাপড় খানাই পরি না—অন্ততঃ আজকের দিনে—সত্যবালা আর আপত্তি করলেন না, হয়তো ভাবলেন তাঁর বউ 'শুধুই সোণা'! তাকে সাজাতে হয় না,—তাছাড়া ছেলের যাতে সন্তোষ হয়—

• • o o

আকাশের সেই বিদ্যুৎগর্ভ মেঘখানা একটু একটু ঘনিয়ে আসে—ধরণীর বুকে রুদ্র ছায়া ফেলে। উতলা বাতাস পথের ওপর দিয়ে হুহু করে ছুটে যায়, দুধারে বাড়ীর রুদ্ধ দ্বার—বাতায়নে করাঘাত ক'রে—পথ ভোলা পথিকের মত।

দুটী প্রতীক্ষমানা নারীর উৎকর্ণ উৎকণ্ঠিত প্রাণ চঞ্চল হয়ে দুলে দুলে ওঠে—এখনো এলো না কেন?

সত্যবালা আকাশ পানে তাকিয়ে উদ্বিগ্নস্বরে বলছিলেন—

এক অলক্ষণ বাপু? আজকের দিনেই কি সব দুর্য্যোগ! বলে দিলুম দেরী না করতে—

লতিকা শঙ্কিত মনে ভাবছিল—এ তারি দুর্ভাগ্যের সূচনা নাকি? তার নিরালা অন্তরের কোণে সযতনে জ্বালিয়ে রাখা—মিলনোৎসবের শুভ্র দীপখানি মলিন কবতেই বুঝি—

মা! মা কই? বউদি?—

কেরে সুরেশ? একা যে? ওরা কই?—নরেশ—

মায়ের ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তরে সুরেশ উৎফুল্ল মুখে বল্লে—দাদা, বাবা, একটু পরে আসছেন। আমি বিনয়বাবুর সঙ্গে চলে এলুম তোমাদের খবর দিতে। সকলেই আস্‌ছিলেন—কিন্তু দাদাকে বিনীতাদি ধরে নিয়ে গেলেন সদল বলে 'রিসিভ্' করতে—

কোথায় ও তো নিজেই থাকে পরের বাড়ীতে!

'পর' নয় বন্ধু, তারাই সব আয়োজন করেছে। সত্যি অদ্ভুত লোক এই বিনীতাদি: সেই যে একটা গান আছে না—সবঠাঁই মোর ঘর আছে—লতিকা বাধা দিয়ে রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলে—তিনিও কি আসবেন ওদের সঙ্গে?

সুরেশ মাথা নেড়ে বল্লে—বলেছিলুম তো আসতে, কিন্তু যেরকম ব্যস্ত দেখলুম ওকে—কি জানি আসেন কি না? আবার বললে কি একটা মিটিং করবেন নাকি দাদাকে নিয়ে।—মেয়েটী কিন্তু খুব জোগাড়ে আছে? লতিকার মুখখানি বাসি ফুলের মত শুকিয়ে গেল। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অস্বাভাবিক দ্রুত হয়ে উঠল। মা ব্যাজার হয়ে বল্লেন—

—থাক্ কাজ নেই আর হুজুগ তুলে, ঢের হয়েছে! এদ্দিন পরে ঘরের ছেলে ঘরে আস্‌ছে—কোথায় নিশ্চিন্দি হয়ে দুটো

দিন বিশ্রাম করবে, তা নয় অমনি করেই তো ছেলেগুলোকে নাচিয়ে তোলে সব—সোজা বাড়ীতে এলেই হ'ত, এখনি ঝড় জল এসে পড়বে—

—তাতে কি? ওরা তো আসবেন মোটরে, তবে আমার অত কষ্টে সাজানো—নষ্ট হয়ে যাবে এই যা। আচ্ছা, এখন সে ভাবনা রেখে আমাকে কিছু খেতে দাও দেখি। আনন্দে ক্ষিদে বেড়ে যায় না মা? তাতে ঘরে যদি ভাল ভাল খাবার থাকে!—সত্যি, নাড়ী একেবারে চোঁ চোঁ করতে লেগেছে,—শুধু ফুলের মালা আর বক্তৃতায় আত্মারাম খুসী হলেও—জঠর জ্বালার শান্তি হয় না তো? সেই জন্যেই 'পগার' দিলুম—

সুরেশ একখানা পিঁড়ি টেনে নিয়ে বসে পড়ল, বল্লে—দেখি দাদার জন্যে মিষ্টি কি কি করেছ? আগে থাকৃতে চেকে রাখা ভাল—কি বলো বউদি!

. মা অনন্দের হাসি হেসে বল্লেন—

—দাওতো বউ মা! একখানা রেকাবে করে—

লতিকা মায়ের হস্তে প্রস্তুত মিষ্টান্নে রেকাব ভর্ত্তি করে সাম্‌নে এনে রাখতেই সুরেশ উৎফুল্ল স্বরে বলে উঠল—

—অরে বাঃ বাঃ! এযে অনেক কাণ্ড করেছ মা। আমি জেলে গেলে আমার জন্যেও এসব করতে? অ্যাঁ?

—আঃ! কি বকিস্ সুরেশ। সকলকেই জেলে যেতে হবে নাকি?

—গেলে তো ভালই হয়! সত্যি ঠাট্টা নয় মা, দাদার আজকের মান্য যদি দেখতে! কি চমৎকার তাঁকে দেখাচ্ছিল, বিনীতাদি যখন স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে তাঁর কপালে চন্দন, .

গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিলেন—দাদার দৌলতে আমরাও খুব সম্মান পেয়ে গেলুম কিন্তু, এই মালাটা—

লতিকার ব্যথা শুষ্ক মুখের পানে উজ্জ্বল নয়নে চেয়ে সুরেশ নিজের গলার গোলাপ ও মল্লিকায় গাঁথা মালাছড়াটি খুলে লতিকার কণ্ঠ লক্ষ্য করে ছুড়ে ফেল্লে, বল্লে—এ মালা তোমার প্রাপ্য বউ দি। তুমিতো গেলেনা দাদার সম্মান গৌরবের তুমিই যে প্রধান অংশীদার!

মালাটা লতিকার গলায় না পড়ে পড়ল কাঁধে, ফুলের কোমল স্নিগ্ধ পরশ, মিষ্ট সৌরভ তার সারা অঙ্গে বিষের দাহ ছড়িয়ে দিলে, তার বুকের রক্ত যেন ছানাৎ ছনাৎ করে উঠল। মালাটা সুরেশের কোলের ওপর ফেলে দিয়ে সে গম্ভীর মুখে বল্লে—থাক্ ও তুমিই নাও, আমার চাই না—

একটা আস্ত পান্তুয়া মুখে পুরে চিবোতে চিবোতে সুরেশ বল্‌লে—হুঁঃ! চাই না বল্‌লেই হল কি না? পড়তে যদি বিনীতাদির পাল্লায়! কিন্তু ভারি মজা হবে বউদি, বিনীতাদি যখন তোমাকে হঠাৎ দেখবেন—আমিতো বলিনি দাদার বিয়ে হয়েছে, দাদাও বোধহয়—ওকি? চল্‌লে কোথায়?—

—আসছি—ঘরের জান্‌লাগুলো দেখি বন্ধ আছে কি না, ঝড় তো এসে পড়ল—

বাহিরের চেয়ে লতিকার অন্তরের ঝড়ই তখন প্রবল হয়ে উঠেছিল, নির্জ্জন ঘরটীতে, অকাল-সন্ধ্যার আবছায়ায় নিজেকে গোপন করে সে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। ভিজে কাপড়ে জড়ানো একগাছি বেলফুলের শুভ্র সুন্দর মালা বার করে সে নরেশের ফোটোখানার ফ্রেমে সন্তর্পণে জড়িয়ে দিলে। এ মালা লতিকা

লুকিয়ে রেখেছিল স্বামীকে নিজের হাতে নিভৃতে পরাবে বলে কিন্তু—

স্বামীর নির্জীব প্রতিকৃতির পানে এক মুহূর্ত্ত নিষ্পলকে চেয়ে থেকে তার মাথাটা লুটিয়ে পড়ল সেই ছবির তলায়।

আহত ক্ষুব্ধ চিত্তের আকুল আকাঙ্ক্ষা, মরমের অব্যক্ত রুদ্ধ বেদনা অবাধে উৎসারিত করে লতিকা বল্‌লে—রাজা আমার! দেবতা আমার! এ দীন পূজারিণীর পূজা তুমি কি সত্যিই নেবে না! কেন গো? কি অপরাধে?

বাইরে—তখন ঝড়ো হাওয়া গর্জ্জন করছে গোঁ গোঁ করে, ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিও পড়ছিল। সেই ঝড় জলের মাতামাতির মধ্যে মোটরের 'হর্ণ'—শোনা গেল সঙ্গে সঙ্গে সত্যবালার চীৎকার—

ও সুরেশ! ওরা এল বুঝি? ওরে দেখরে দেখ! কেষ্টকে বল্‌না আলো জ্বালতে, বাইরে যা অন্ধকার! ক্ষমা! ওমা ক্ষমা গেল কোথায়? ঠিক এই সময়টীতে ওলো ক্ষেন্তী! বউমাকে ডেকে দেনা কি যে সব বুদ্ধি!

লতিকা সচকিত হয়ে ছুটে গেল—আঁচলে মুখ মুছতে মুছতে। এগিয়ে যেতে সাহস হল না, শাশুড়ীর আড়ালে থেকেই সে দেখলে—স্বামীকে সকল ইন্দ্রিয় দৃষ্টিপথে এনে,—কতদিন পরে দেখা—ছ'মাস না ছ'যুগ! বিরহ প্রেমকে মধুর করে, প্রেমাস্পদকেও সুন্দর করে বুঝি!—কি মনোহর দিব্যকান্তি! চোখ দুটীতে স্বর্গের আলো, গলায় একরাশি ফুলের মালা। ঠিক যেন সেই স্বপ্নে দেখা—শুধু মাথায় মুকুট নেই, আর বিনীতাও...লতিকা উৎসুক দৃষ্টি চারিদিকে ফেলে দেখলে নাঃ, সে আসেনিতো!

সত্যবালা যখন আস্তে ব্যস্তে বাষ্পরুদ্ধ গদ গদ কণ্ঠে—নরেশ! বাপ্ আমার! দুঃখিনী মাকে কি এত কষ্ট দিতে হয়রে?—বলে প্রণতঃ পুত্রকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, তখন—

তোমার কোলে তো ফিরে এসেছি মা। আর এখন কান্না কেন? বল্‌তে বলতে নরেশ মায়ের পশ্চাৎবর্ত্তিনীর পানে একবার চকিতে চাইল, লতিকার মুখের ওপর একটু খানি ঘোমটা থাকলেও চারি চক্ষে মিলন হল। লতিকা দেখলে যেন আরতির দীপ দুটী! তার শিরায় শিরায় পুলকের উচ্ছ্বাস বয়ে গেল—কে বলে সে অভাগী? সে মহা—মহা-ভাগ্যবতী—এমন দেবোপম স্বামী যার!—

সুরেশ ব্যস্ততার সহিত বল্লে—দাদা! তোমাকে বাবা একবারটী ডাক্‌ছেন—বৈঠক খানায় ক'জন ভদ্রলোক এসেছেন দেখা করতে।

সত্যবালা বিরক্তিভরে বলে উঠলেন—আসুকগে ভদ্রলোক! নরেশকে আমি না খাইয়ে ছাড়তে পারব না, আহা! বাছা আমার কদ্দিন পেট ভরে খায়নি—নরেশ হেসে বল্লে—ও কথা বলো না মা! তাহলে সরকার বাহাদুরের দয়ার অপমান করা হয়!—A class এ ছিলুম, খেয়েছি পেট ভরেই, তার প্রমাণ দেখছ না? দেহখানা ওজনে দু পাউণ্ড—

ষাট্ ষাট্! অমন করে বলতে নেই। আচ্ছা, তাহলে একটু মিষ্টি মুখ করে—

মিষ্টিমুখ আগেই হয়ে গেছে মা!—বিনীতা কি ছাড়ে? আমাকে যা খওয়াবার সেই রাত্তিরেই খাইও, এখন যেতে দাও, ঝড় জল মাথায় করে এসেছেন—

সে রাতে খাওয়ার ব্যাপার চুকতে অযথা দেরী হবে বলে সত্যবালা বউকে আগেই খাইয়ে দিয়েছিলেন।

লতিকা পানের ডিবে নিয়ে ওপরে যেতে যেতে শুনতে পেলে নরেশ বলছে—বাঃ! গোকুল পিঠে তো চমৎকার হয়েছে মা! আর এগুলো—কি বলে?—

ক্ষিরের পুলী, তুমি 'পিঠে' খেতে ভালবাস তাই।

সুন্দর হয়েছে! এ সব খাবার কাল পর্য্যন্ত থাকবে নাকি?

কেন থাকবে না? 'পিঠে' যে বাসি হলে আরো ভাল লাগে।

তাহলে খানকতক রেখে দিওতো! কাল বিনীতা আসবে এখানেই খাবে, বলে দিয়েছে গাড়ী পাঠাতে কিন্তু, সুরেশ! কাল তোমার ছুটী—না?

হ্যাঁ, কাল যে রবিবার।

তাহলে আমি যদি ভুলে যাই তুমি মনে করে গাড়ী নিয়ে যেও তো।

কখন আসবেন?

এই সকাল বেলাই। সন্ধ্যার দিকে আবার কি সব আড়ম্বর করেছে, বারণ করলে শুনবে নাতো? ছ'মাস জেল খেটে আমি যে কি 'অবতার' হয়ে এসেছি! সত্যি ভারি লজ্জা করে আমার।

কথাগুলো লতিকার বুকের ভেতর যেন কাঁটার মত বিঁধতে লাগল। হায়! আবার! আবার সেই বিনীতা! প্রতি কথায় প্রতি কাজেই সে যে এসে পড়ে অনাহূত হয়ে, কেন?

১০

ভাল ছিলে লতিকা ?

পুলক জড়িত সলাজ হাসি হেসে লতিকা উত্তর দিলে—ছিলুম একরকম। তুমি? তোমার কষ্ট হয়েছে খুব না?

কষ্ট? নাঃ, কষ্ট আর কি? তবে হ্যাঁ, বাড়ী আর জেল এ দুইয়ে তফাৎ আছে এটা মানতেই হয়। বাড়ীর কথা মনে করে এক এক সময় ভারি মন কেমন করত।

লতিকা নরেশের মুখপানে তাকিয়ে বিস্ময়ের সহিত বলে উঠল—মন কেমন করত? তোমার!

হাঁ, এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে লতিকা! আমি তো সত্যি সত্যি পাথর এখনো হইনি হবার সাধনা করছি মাত্র। সবের বেশী কষ্ট হত মার জন্যে। আর—একটু থেমে, লতিকার আগ্রহদীপ্ত মুখ থেকে চোখ নামিয়ে নরেশ ধীরে বল্‌লে তোমার কথাও মনে পড়ত, যখন তখন, কি জানি কেন?

কথা ক'টী শ্রোত্রীর তৃষিত কাণে ও প্রাণে যেন সুধা সিঞ্চন করল কিন্তু বক্তা কেমন যেন বিমনা হয়ে গেল। সে ভাবটা চাপা দেবার উদ্দেশ্যেই সে যেন ব্যগ্রতা দেখিয়ে বল্‌লে—বসো না লতিকা, দাঁড়িয়ে থাক্‌বে কতক্ষণ? তোমার কাছেও আমি একটা অদ্ভুত হয়ে উঠলুম নাকি?

আনন্দে লতিকার চোখে জল এসে পড়ছিল এযে আশার অতীত! স্বামীর পাশে বসে মৃদু গাঢ়স্বরে সে বল্‌লে—

অদ্ভুত না হোক্ দুর্লভতো বটেই? সত্যি এ ক'মাস যা করে কেটেছে!

লতিকার আপাদ মস্তক সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখে নরেশ ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল তাইতো, রোগাওতো হয়ে গেছ দেখছি। আশ্চর্য্য! আমি ছ'মাস জেল খেটে রোগা হলুম না আর তুমি—বাপের বাড়ী ছিলে, না?

হ্যাঁ, বাবা আমাকে নিয়ে গেছলেন, কিন্তু তাতে কি? বাপ মার কাছে থাকলেই মেয়েমানুষের সকল অভাব পূর্ণ হয় বুঝি?

না, তাতো হয় না। কিন্তু তোমার কথা যে আলাদা লতিকা, আমি যে তোমার প্রতি কোনো কর্ত্তব্যই করতে পারিনি। তবু আমাকে তোমার এত কি দরকার তাতো বুঝতে পারি না—

ছ'মাস পূর্ব্বে এ প্রশ্নের উত্তরে লতিকা যা বলেছিল আজ সেই কথা গুলোই প্রবল উচ্ছ্বাসের মত তার গলার কাছে ঠেলে এলো, কিন্তু লতিকা তা জোর করে চেপে রেখে ধীরে একটা নিশ্বাস ফেলে বল্লে—

তাই বুঝতে যদি তাহলে আমার আর দুঃখ কি?

নরেশ লতিকার একখানা হাত কোলের ওপর টেনে নিয়ে দরদ মাখা স্নিগ্ধ স্বরে বল্লে—

লতিকা! তোমার দুঃখ আমি কি বুঝিনি? ভাল করেই বুঝি। সেই জন্যই তোমার কথা মনে করে সময় সময় আমার মনে এত কষ্ট হয় কি বলব? কিন্তু প্রতিকার করবার উপায় নেই। আমি না বুঝে যা ভুল করে ফেলেছি—

কিসের ভুল?

এই আমার এই ছন্নছাড়া জীবনের সাথে তোমাকে জড়িত করে—এযে কত বড় সাংঘাতিক ভুল—শুধু ভুল নয় অপরাধ—

কিন্তু এ ভুল তো তুমি ইচ্ছে করলেই সংশোধন করতে পারো—

নরেশ মাথা নেড়ে উচ্ছ্বসিত আবেগের সহিত বলে উঠল—

না, না, তা আর হয় না, লতিকা? আমি যে বিপুল কর্ম্মভার স্বেচ্ছায় মাথায় তুলে নিয়েছি, যে মহান ব্রতে জীবন উৎসর্গ করেছি—

তোমার সে কাজের ভাগ, ব্রতের ভাগ, যদি আমাকে দাও—পারবে নাকি দিতে? দেব ব্রাহ্মণ, অগ্নি সাক্ষী করে যাকে সহধর্ম্মিণী, জীবন-সঙ্গিনী বলে গ্রহণ করেছ তাব এই দাবীটুকু—পূর্ণ করা কি এতই কঠিন?

নরেশের এক মুহূর্ত্ত বাক্যস্ফূর্ত্তি হল:না, ফুলের মালায় সাজানো নিজের ছবিখানার দিকে খানিক স্তব্ধভাবে চেয়ে থেকে, নিঃশব্দে একটা গভীর নিশ্বাস ফেলে সে বল্লে—তোমার এ দাবী অসঙ্গত নয় লতিকা—খুবই সঙ্গত। কিন্তু তুমি বুঝতে পারছ না—ভার দেওয়াটা কিছু কঠিন নয়—নেওয়াই:কঠিন। তুমি আমার কাছে যে ভার নিতে চাইছ তা বহন করবার শক্তি যদি তোমার না থাকে, যদি এ বিপুল ভার বইতে না পারো তুমি দুর্ব্বল মেয়ে মানুষ—

কিন্তু বিনীতা ও মেয়েমানুষ! সে যদি পারে তবে—নরেশ সহসা চমকে উঠল। লতিকার হাতখানা মুঠোর মধ্যে চেপে সে উত্তেজিত ভাবে, ব্যগ্রতার সহিত জিজ্ঞাসা করলে—

বিনীতা! বিনীতাকে তুমি জানো নাকি? কেমন করে? কে বল্লে—

নরেশের সেই অহেতুক উত্তেজনা, অসম্ভব ব্যগ্রতায় লতিকার মনের তলায় চাপা-পড়া মেঘটুকু আবার ঘনিয়ে এলো, বিরাট আকার ধারণ করে। কতক্ষণ তার মুখে কথা ফুটল না।

কি? চুপ্ করে গেলে যে? বিনীতার কথা তোমাকে কে বল্‌লে শুনি—

লতিকা বিনীতাকে কি করে জেনেছে—কেমন করে দেখেছে—তা গোপন করে শুধু বল্‌লে—

কেন? তুমিই তো বল্‌লে—

কই? কখন?—

এই যে খানিক আগেই—মা'কে বল্‌ছিলে না—বিনীতাকে তুমি নেমন্তন্ন করে এসেছ—

'ওঃ! তাই বলো?

নরেশের দৃঢ় মুষ্টি শিথিল হয়ে গেল। সে যেন একটা আসন্ন বিপত্তি থেকে মুক্তি লাভ করে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়ে বল্লে, বিনীতা নিজেই আস্‌তে চাইলে তাই। ও মেয়ে নেমন্তন্ন আমন্ত্রণ ধারে ধারে নাতো, জোর করে নেওয়াই যে ওর স্বভাব।

কিন্তু এ জোর সে পায় কেমন করে? লতিকা যে জিনিষ কায়মনে কামনা করে পায়নি—সে তাই অনায়াসে—কথাটা লতিকার ঠোঁটের কাছে এসে আটকে গেল। তার ভাবান্তরিত মুখের পানে চকিত দৃষ্টিতে চেয়ে নরেশ বল্‌লে, "এবার শুয়ে পড়া যাক্, শরীর যেন এলিয়ে পড়ছে, আজকের ভোগান্তি কম হয়নি তো? প্রায় সারাদিনটাই...

নরেশ লতিকার হাতখানা ছেড়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল। তার মুখ চোখের ভাব বাস্তবিক বড় ক্লান্ত। ঝড় বৃষ্টি হয়ে গিয়ে বেশ ঠাণ্ডা ছিল তবু সে কপালের ঘাম মুছছে দেখে লতিকা বললে,—

ফ্যানটা খুলে দেব ?

দাও।

লতিকা ফ্যান খুলে দিয়ে নরেশের পায়ের কাছে বসে কুণ্ঠিতভাবে বললে—পায়ে একটু হতে বুলিয়ে দিই ?

নরেশ শশব্যস্তে বলে উঠল—না না, কেন ? কি হয়েছে আমার ? দিব্যি সুস্থ মানুষ, না, আমার কিচ্ছু দরকার নেই লতিকা ! তুমি শুয়ে পড়ো রাত হয়েছে।

লতিকা পায়ের তলা থেকে উঠে এল, কিন্তু শুতে পারল না। সে বাইরে যতই অটল থাকবার চেষ্টা করুক অতৃপ্ত সেবিকা নারীচিত্ত তার প্রিয়তমকে এতটুকু প্রাণের সেবা দেওয়াব তরে, একটুখানি স্নেহস্পর্শ পাওয়াব তরে একান্ত উন্মুখ ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। তাই সে নরেশের পাশে বসে তার শ্রান্ত কপালে মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। নরেশ এবার আব আপত্তি করলে না, বরং চোখ বুজে পরিতৃপ্তির সহিত বললে—আঃ ! ভারি আরাম লাগছে তো ? ঘুম পেয়ে যাচ্ছে যেন—আজ এত বেশী ক্লান্ত হয়ে পড়েছি—

নরেশের বাস্তবিক তন্দ্রাকর্ষণ হচ্ছিল। লতিকার বুকের দরদ ঢালা কোমল করের মিষ্ট সেবাটুকু মিনিট কতক উপভোগ করেই সে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু লতিকার চোখে আজ ঘুম ছিল না। তার অতন্দ্র পিয়াসী আঁখি দুটী স্থির হয়ে

রইল নরেশের মুখের পানে। সবুজ বাতির স্নিগ্ধ আলোটুকু নিদ্রিতের সুপ্তি নিথর মুখখানিতে যেন মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছে, কি সুন্দর! কপালে পড়া এলোমেলো চুলগুলি সযত্নে সরিয়ে দিতে দিতে লতিকা আপন মনে ভাবতে লাগল এমন সরল সুন্দর মুখ যার তার প্রাণে কি ছলনা কপটতা থাকতে পারে? না না, এ মিছে সন্দেহ! এ রত্ন তার—আর কারও নয়। ঐ পবিত্রতার হাসিমাখা মধুর অধরে তারই জীবনের সুখ, যৌবনের স্বপ্ন ঘুমিয়ে আছে। আর ঐ বুক—শুভ্র নিষ্কলঙ্ক, উদার, ওই তো তার স্বর্গ। এ স্বর্গ ভ্রষ্ট হয়ে সে বাঁচে কেমন করে?

ধীরে ধীরে নিজের অজ্ঞানিতে লতিকার মাথাটা সেই বুকের পরে ঢলে পড়ল ক্ষণিকের জন্য, ক্ষণিকের জন্য মনে হল—তার জীবনের সকল ব্যথা সকল ব্যর্থতা সার্থক হয়ে গেছে। এই পাওয়াটুকুই তার পরম পাওয়া!

১১

বউ মা—নরেশ কি বেরিয়ে গেল?

হ্যাঁ মা অনেকক্ষণ।

কোথায় গেল?—

তাতো জানি না, কি একটা জরুরী কাজে—

ঐ তো তোমার ভুল বাছা!—কাজ বল্লেই অমনি ছেড়ে দিতে হয়? এদ্দিন পরে ঘরে এলো—এখন তোমার একটু শক্ত না হলে তো চলবে না,—এই যে সাত সকালে বাসিমুখে জল না দিয়েই বেরিয়ে গেল তুমি বারণ করলে না কেন?

বধূর মুখের প্রসন্নতার দীপ্তি সত্যবালাকে আশ্বস্ত করেছিল, তাই ফাঁসটা যাতে ফস্‌কে না যায় বলেই তা'র এ সতর্কতা।

লতিকা তা'র প্রশ্নোত্তরে আরক্তমুখে শুধু বল্লে—

এসে খাবেন বলে গেছেন—শীগগিরি ফিরবেন।—

আচ্ছা, আমি ততক্ষণ আহ্নিক সেরে নিইগে, এর মধ্যে যদি সে ফেরে তুমি খাবার দিও—যা খেতে চায়—বুঝলে ?

শাশুড়ী ঠাকুরঘরে ঢুকতেই লতিকা সুরেশের সন্ধানে গেল, সুরেশ তার ঘরে বিছানায় আড় হয়ে পড়ে 'ফিলজফি' খানা দেখছিল, লতিকাকে দেখেই উঠে বসে, হাতদু'খানা উঁচু করে সহাস্তে বলে উঠল—স্বাগত বৌদি!—

তার বল্‌বার ভঙ্গীতে লতিকা হেসে ফেলে বল্লে—হয়েছে গো! হয়েছে!—এতো তোমার আচ্ছা বাতিক ধরে গেল ঠাকুর পো! কিন্তু শুধু মুখে স্বাগত বল্লেই তো হয় না, কাজ করতে হয়।

কি করতে হবে বলো না ? হুকুম ?—

লতিকা কাছে এসে, সুরেশের ঝুলে পড়া পাশ বালিসটা যথাস্থানে রেখে একটু বাধ-বাধ ভাবে বল্লে—

কই গেলে না এখনো ?

কোথায় ? কলেজে ?—বাস্‌! তোমার কি ইচ্ছে ছুটীর দিনেও—তবু তো সকাল বেলাই বই নিয়ে বসেছি, সুবোধ বালকের মত—

না, কলেজে যেতে কে বলেছে ? তোমার বিনীতাদিকে—

ওঃ হো! ভাগ্যে মনে করিয়ে দিলে বউদি, নইলে দাদার কাছে বকুনী খেয়ে মরতুম, দাদা উঠেছেন কি।—

কোন্ সকালে, শুধু উঠেছেন নয় বেরিয়ে গেছেন।

এরি মধ্যে?—আচ্ছা লোক বাবা! এতটুকু আলিস্যিও কি আসে না শরীরে? কিসে গেলেন সাইকেলে?

বোধ হয়—

দেখ দেখি? মোটরে গেলেই তো হ'ত তাহলে ফেরবার পথে বিনীতাদিকে ও আনতে পারতেন স্বচ্ছন্দে। আমাকে শুধু শুধু হয়রাণ করা—

লতিকা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে—

আহা! তা কষ্ট একটু করলেই বা ভাই, বান্ধবীটীর জন্যে—

দুর! বান্ধবী আমার—না দাদার?

তাতে কি? দাদার ভাই-ই তো তুমি? তোমার সঙ্গেই ও খেলা ধূলো ছুটোপাটী করত—তুমি নিজের মুখেই তো বলেছ?

হুঁ, সে যখন কর্‌ত তখন কর্‌ত—এখন আর সে বিনীতাদি নেই গো!—এখন উনি কত কাজ করছেন—বাস্তবিক,-মেয়েদের অমন স্বাধীন, স্বাবলম্বী, বেপরওয়া জীবন আমার তো বেশ লাগে,—কি বলো বউদি?

লতিকা আস্তে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বল্লে—

উনি বিয়ে করেন নি—তাই—

তাতো নিশ্চয়ই। বিয়ে করলে কি ঘর ছেড়ে এক পা নড়তে পারতেন? তাহলে তোমারই মত বন্দী—বন্ধনে ধরা পড়তে হ'ত, ঠিক বলেছ বউদি! পুরুষ যেমন জোর করে বন্ধন মুক্ত হতে পারে মেয়েরা তো তা—ঐ দেখ—বসে বসে খালি গল্পই করছি, যাই, বাবাকে বলে গাড়ী নিয়ে নইলে দাদা ফিরে এসে—

শুধু বকুনী নয়—মার!—পিঠ খানা শক্ত আছে তো?

হুঁ! মারতে আর হয় না! এখন তো আমি একলা নই? বাঁচাবার লোক আছে—

সুরেশ আপন মনে খুব একচোট হেসে নিয়ে জামাটা হাতে করেই চলে গেল লম্বা লম্বা পা ফেলে। কিন্তু মিনিট পাঁচেক বাদেই সে ফিরে এলো হাঁপাতে হাঁপাতে—

বউ দি! ও বউ দি!—উনি এসে গেছেন—

লতিকা তখন ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির দিকে যাচ্ছিল শাশুড়ীর পূজা হ'ল কিনা দেখতে—সুরেশের কথায় সে থমকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কই? কার সঙ্গে এলেন?

দাদার সঙ্গে, আমি তো আগেই বুঝেছি, দাদা যখন বেরিয়েছেন—লতিকার মুখখানা পাঙাশ্ হয়ে গেল। এই আনতে যাওয়া কিছু দোষের নয়—কিন্তু তাকে লুকোবার কি দরকার ছিল?

ঐ যে ওঁরা এসে পড়লেন, তুমি এখন নীচে যেওনা, দোহাই বউদি! বিনীতাদিকে চমকে দিতে হবে তোমায় হঠাৎ দেখিয়ে তুমি ধৈর্য্য ধরে এই খানেই একটু দাঁড়িয়ে থাকো লক্ষী বউ দি! আমি আসছি এখুনি—দেবরের সেই সানুনয় অনুরোধ লতিকা অগ্রাহ্য করতে পারল না, করবার শক্তি ও ছিল না তার, পা দুখানা যেন সেইখানে জমে গিয়েছিল। লতিকার কাণে গেল নরেশের কণ্ঠস্বর—

মা! মাগো! কোথায় গেলে? দেখ কে এসেছে। অনড় প্রায় পা দুখানা একটু খানি সরিয়ে লতিকা উঁচু আলসের 'ফোকোর' দিয়ে দেখলে নীচের উঠোনে দাঁড়িয়ে নরেশ আর তার হাত ধরে বিনীতা!

কেরে? কে এলো? সত্যবালা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে বিনীতাকে দেখে আনন্দ প্রকাশ করে বল্লেন—এই যে বিনু! কেমন আছিস্ মা? অনেক দিন পরে দেখা।

ভালই আছি মাসিমা।

বিনীতা সহাস্য মুখে তা'র পায়ের ধুলো তুলে নিলে। সত্যবালা আশীর্ব্বাদ করে বিনীতার চিবুকখানা ধরে সাদরে বল্লেন কই ভাল তো দেখাচ্ছে না মা! আগের চেয়ে কত রোগা রোগা?

বলো কি মাসিমা এরচেয়ে মোটা হলে একদম্ ফুটবল হয়ে যাব যে!

কথাটা বলেই বিনীতা মুক্তকণ্ঠে হেসে উঠল, কি সরল সে হাস্যোচ্ছাস! লতিকা দেখলে মেয়েটির সাদা-সিদে খদ্দরের পোষাক একান্ত অনাড়ম্বর, রূপেও বিশেষত্ব নেই কিছু কিন্তু তার চোখে মুখে এমন একটা নির্ভীক তেজস্বিতা ও শুচিতার নির্ম্মল দীপ্তি দেখা যায় যাতে দর্শকের মনে স্বতঃই শ্রদ্ধার ভাব আসে।

বিনীতার পানে করুণ দৃষ্টিপাত করে নরেশ মাকে বল্লে—তোমার বিনুর জীবনে অনেক পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে মা, বিশ্বপতিবাবু মারা গেছেন, তাঁর স্ত্রীও। এক বছরের মধ্যেই দুজনে।

আ হা হা! তাই বুঝি—শচী কেমন আছে কি করছে সে?

দাদা ভাল আছে, বিয়ে থা'ও করেছে, দেশের মাটি ভাল লাগল না, তাই ডেপুটী হয়ে সাত ঘাটের জল খেয়ে বেড়াচ্ছেন।

আর রন্তু? সেকি এখনো সেই রকম—

এবার সুরেশের গলা শোনা গেল—

ওসব পরিচয় পরে নিও মা! বিনীতাদিকে উঠোনে দাঁড় করিয়ে কতক্ষণ—উহুঁ তোমার ভাঁড়ার ঘরে ঢুকিও না, ওপরে চলো, চা'টা সব ওপরেই—

—চা তো আমি খাইনা সুরেশ!

ও হো! ওটা বিদেশী মাল না? দাদাও তো ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু স্বদেশী চা' ও তো—

—থাক না, কি দরকার চা না খেয়েওত তো দিব্যি থাকা যায়।

নরেশ বল্লে—হাঁ মা বিনীতা মাছ মাংস ত্যাগ করেছে, ওর জন্যে নিরিমিষ রাঁধতে বলো।

ও মা! কেন রে বিনু! আগে তো মাছ মাংস নইলে মুখে ভাতের গরাস্ উঠত না—

কথা কইতে কইতে সকলে সিঁড়িতে উঠছেন দেখে লতিকা আত্মগোপন করতে নিজের ঘরে ঢুকল গিয়ে। কিন্তু নরেশ সদলবলে সেই ঘরেই এসে হাজির! লতিকাকে থতমত ভাবে সরে যেতে দেখে সুরেশ সকৌতুকে মুখ টিপে হাসতে লাগল। বিনীতা কুণ্ঠিতা লতিকার পানে তাকিয়ে মুগ্ধ বিস্ময়ে বলে উঠল—এটী কে মাসিমা?

—ও যে আমার বউমা; নরেশ বলেনি বুঝি?

—না, বারে! আপনি তো বেশ লোক নরেশবাবু। চুপি চুপি কবে বিয়ে করলেন এমন সুন্দর বৌ—কেন? আমাকে জানালে কি আমি—

বিনীতা লতিকার আরো কাছে এসে, তার মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত খুঁটিয়ে দেখতে দেখ্তে মুগ্ধকণ্ঠে প্রশংসমান স্বরে বল্লে—

বাস্তবিক কি সুন্দর বউ করেছ মাসিমা! অথচ আমাকে একটা খবর পর্য্যন্ত দাওনি

বধূর কুণ্ঠানত সুন্দর মুখখানির পানে সস্নেহে তাকিয়ে সত্যবালা একটা ক্ষোভের নিঃশ্বাস ফেলে বল্লেন—

খবর আর দেব কি মা? যা করে বিয়ে হল! নরেশ কিছুতেই রাজি হয় না, একরকম ধর পাকড় করেই—ওকি বউ মা! বিনুর কাছে তোমার লজ্জা কি? ওতো প্রায় তোমারই সমবয়সী। আচ্ছা, তোমরা এখন আলাপ করো, আমি যাই এদের খাবার—

সকালবেলা কিছু খাইনা মাসিমা, একেবারে সেই দুপুর বেলা।

আহা! সেকি কথা? এই বয়সে সব ছেড়ে-ছুড়ে সত্যি, এ তোদের কি অনাসৃষ্টি কাণ্ড বল দেখি, নরেশের তো খাওয়া দাওয়ার হুঁসই থাকে না, সেই কোন্ সকালে বাসিমুখে বেরিয়ে গেছে—

সেজন্যে দুঃখ করো না মা! বিনীতা আমাকে যথেষ্ট খাইয়ে দিয়েছে। সরবৎ, ফল মিষ্টি—তুমি ব্যস্ত হয়ো না বসো।

না বাবা, এখন কি আমার বসবার ফুরসৎ আছে? ঠাকুরকে রান্নার যোগাড় সব বুঝিয়ে না দিলে—আবার আঁস্ নিরিমিষ আছে তো!

আমার শুধু ভাতে ভাত হলেই হবে মাসিমা! বেশীর ভাগ আমি ঐতো খেয়ে থাকি—

বেশ করো! যত সব বিদ্‌ঘুটে। অমন মূর্ত্তি হয়েছে তাই না? এ কিন্তু তোমার ভারি অন্যায় মা!

যারা খেতে চায়না, তাদেরি সাধ্য সাধি করবে কেবল,

আর যে পেটের জ্বালায় চোখে কাণে দেখতে পাচ্ছে না তাকে জিজ্ঞাসাও—

সুরেশের কথায় মা স্নেহের হাসি হেসে বল্লেন—

তোর আবার ক্ষিদে পেয়ে গেছে? সকাল বেলাই তো চায়ের সঙ্গে—

ওঃ! তাতে কি হয়? বাড়ীতে অত সব খাবার থাকতে। চলো, আরো কিছু দাও বাছার মুখে। ওকি বৌদি তুমি ও আসছ যে? তোমারো ক্ষিদে পেয়ে গেল নাকি? না বাপু! তা হবেনা, তুমি হলে বাড়ীর বউ, অতিথিকে অভুক্ত রেখে আগের ভাগে—

লতিকা থতমত খেয়ে যেখানকার সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল। শাশুড়ীও বলে গেলেন তাকে সেখানেই থাকতে, থাকাও দরকার—অন্ততঃ ভদ্রতার খাতিরে। নরেশ ইজিচেয়ার খানায় বসে পরে বল্লে—

বসো বিনীতা! তোমার কাছে আমার অনেক কিছু জানবার আছে।

বসছি—আগে আপনার গৃহলক্ষীকে বসতে বলুন—

বিনীতা বিমূঢ়া লতিকার হাত খানা ধরে সহাস্যে বল্লে—তুমি অমন আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে তো চলবে না ভাই! তাহলে যে অতিথিকেও দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

লতিকা মৃদুকুণ্ঠিত স্বরে বল্লে—অপনি বসুন না?

এই দেখ! আমি তোমাকে আপনি বলতে পারলুম না, আর তুমি স্বচ্ছন্দে—না ভাই, আমাকে অত মান্য করে কথা কইতে হবেনা, গরীব মানুষ—

ইঃ! বিনয়ের যে সীমা নেই! বিনীতা এবার যথার্থই বিনীতা হয়ে গেছে দেখি!

নরেশ কথাটার সঙ্গে সঙ্গে বিনীতার দিকে চাইল—কেমন এক অপূর্ব্বভাবে—অমন সরস মধুর চাউনী সে চোখে লতিকা এর আগে কখনো দেখেনি বোধ হয়। তার কেমন অস্বস্তি লাগছিল সেখানে থাকতে—কিন্তু ভদ্রতার অনুরোধে যত না হোক—বিনীতার উপরোধে পড়ে তাকে বসতেই হ'ল। সে বসল পালঙ্কের একটা ধারে—আর বিনীতা, নরেশের পাশের চেয়ারখানা মাঝা-মাঝি টেনে নিয়ে, যাতে দুজনের সঙ্গেই আলাপ করা চলে। খদ্দরের রুমালখানায় মুখ মুছে ঘরের চারিদিকে তৃপ্তির সহিত দেখতে দেখতে সে বল্লে—বাঃ! আপনার ঘরখানার শ্রী যে এবার একেবারেই ফিরে গেছে নরেশবাবু! আগে কি রকম বিশ্রীভাবে সব এলোমেলো হয়ে পড়ে থাকত— টেবিলের কাগজ পত্রগুলোও কেমন পরিপাটী গোছানো দেখছি—

—আবার ওদিকে নজর কেন? ঘাঁটতে ইচ্ছে করছে নাকি?

—নাঃ, আর সেদিন নেই——এখন ইচ্ছে করলেও— আপনিইতো বল্লেন দুর্ব্বিনীতা বিনীতা হয়ে গেছে!

—বারে! দুর্ব্বিনীতা আবার কখন বল্লুম? দেখ্‌লে লতিকা? ভদ্রলোককে খামখাই মিথ্যেবাদী তয়েরি করা—আচ্ছা, তুমি তো সাক্ষী আছ—

লতিকার মুখখানা অকারণে লাল হয়ে উঠল্। এসব হাস্য পরিহাস সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হলেও লতিকা ঠিক সহজভাবে গ্রহণ করতে পারছিল না, কি জানি কেন—তার কেবলই মনে হচ্ছিল

এদের দুজনের বন্ধুত্বের অন্তরালে এমন একটা প্রচ্ছন্ন রহস্য আছে, যা ভেদ করা তার পক্ষে দুষ্কর।

—হ্যাঁ, ভাল কথা মনে হল,—তোমার মিষ্টার অমিয়র খবর কি বিনীতা, তিনি কি এখনো সুদূর সাগরপারেই—

—সে খবরে আপনার কি দরকার মশাই ?

—দরকার আমার না থাকতে পারে—কিন্তু তোমার আছে তো ?

বিনীতা এবার হাত মুখ নেড়ে সবেগে বলে উঠল্—না, কক্ষনো না ! আত্মবৎ জগৎ ! আপনি নিজের মতই সকলকে দেখতে চান্—না ? সেই লাঙ্গুলহীন শৃগালের মত ?

কথাটার সঙ্গে সঙ্গে তারা দুজনেই হেসে উঠল্।

কিন্তু লতিকা সে হাসিতে যোগ দিতে পারলে না, সে তখন অবাক্ হয়ে ভাবছিল একি সেই নরেশ ? কঠিন হিমাদ্রির পাষাণ বুকের তলে এই যে আনন্দ চঞ্চল স্নিগ্ধ নির্ঝরিণী, এর সন্ধান সেতো এতদিন পায়নি—কি করেই বা পাবে ? এ তার জন্য নয়তো ! মনের সেই বিক্ষিপ্ত অবস্থায় সেখানে থাকা লতিকার পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠল্, কি একটা কাজের অছিলায় সে উঠে গেল শাশুড়ীর কাছে।

° • °

সত্যবালা সকলকে খাইয়ে খেতে বসেছিলেন, পাশে পাখা হাতে বসে লতিকা। বিনীতা সামনের পিঁড়িখানা অধিকার করে খুব গল্প জুড়ে দিয়েছে—একদিন এই মাসিমার কাছে সে কত আব্দার কত অত্যাচারই করেছে, সুরেশকে সে কি রকম জ্বালাতন করত, কি বলে ক্ষ্যাপাত, রতু এখনো মাসিমার

যত্নের কথা ভোলেনি, মা অসুখে পড়েও তাঁর নাম করতেন,—আবার সত্যাগ্রহীর নিগ্রহ, জেলের দুর্গতি, এই সব নানান কথা,—তার মধ্যে নরেশের উল্লেখ ও ছিল না।

লতিকা শুধু শুন্‌ছিল চুপটী করে।

নরেশ ওপরে আল্‌সে থেকে মুখ বাড়িয়ে ডাক্‌লে—বিনীতা!

বিনীতা গল্পে ক্ষান্ত হয়ে চেঁচিয়ে বল্লে—

কি বল্‌ছেন!

—তুমি কি এখনো খাচ্ছ নাকি? বাপ! এই জন্যেই না একবেলা খেয়ে থাক্‌তে পারো!

মা হাস্‌তে লাগলেন—কি ছেলে বাবা! ও বুঝি খাচ্ছে! খাওয়াতো কোন্ কালে হয়ে গেছে ওদের—গল্প করছে বসে—

আহা! গল্প করবার উপযুক্ত স্থানই বটে! ভাঁড়ার ঘরের মোহ কাটানো সহজ নাকি? মুখে যে যতই বলুক—

বিনীতা এবার বাইরে এসে ওপর পানে তাকিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে—

আপনিও আসুন না, কেউতো বারণ করেনি—

থাক্, আমার অত লোভ নেই—

—নাঃ, উনি একেবারে নির্লোভ, মাহাত্মা! দেখছেন মাসিমা! তবু যদি আমি না জান্‌তুম—

বল্‌তে বলতে বিনীতা হঠাৎ ছুটে গেল—সিঁড়িতে তার পায়ের শব্দ, এবং উভয়ের সম্মিলিত হাস্যোচ্ছ্বাস লতিকার শুধু কানে নয় প্রাণেও সজোরে আঘাত করলে। সত্যবালা বল্লেন—

—মেয়েটার পাগলাটে ছিট আজও যায়নি দেখছি। তবু এখন অনেক বদ্‌লে গেছে—কি ধিঙ্গীই ছিল আগে! কিন্তু মনটা

ওর ভারী সরল, আপন পর বোধ নেই, সেই জন্তেই নরেশ ওকে এত ভালবাস্ত।

লতিকার যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো—ভালবাস্ত! না, এখনো বাসে! এযে শুধু বন্ধুপ্রীতি সে কি করে বিশ্বাস করবে!

বধূর উন্মনা ভাব লক্ষ্য করেই বোধ হয় সত্যবালা বল্লেন—

তুমিও যাও না বউমা! আমার খাওয়াতো হয়ে গেছে নরেশ ওপরে একলাটী কেন?

সত্যবালা গলার স্বর খাটো করে বল্লেন—

তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি বউমা, ওর সঙ্গে নরেশকে তফাৎ রাখতে চেষ্টা করো। ও সব মেয়ে সহজ নয়, যারা জেল খাটতে ভয় পায় না—

তাতে দোষ কি মা? এখনকার দিনে তো অনেক মেয়েই জেল খাটছে, তবু উনিতো অবিবাহিতা, যাদের বিয়ে হয়েছে, ছেলে পিলে হয়েছে, তারাও তো স্বামী পুত্র, ঘর সংসার ছেড়ে—

সেটাই কি বড় ভাল কাজ? কি জানি মা, আমরা সেকেলে মানুষ, এই যে মেয়েরা সব ঘরকন্না ফেলে রণ-চণ্ডী মূর্ত্তিতে রৈ রৈ করে বেড়াচ্ছে দেখতে শুনতে যেন কেমন কেমন লাগে। ঐ যে বিনীতা, বিয়ে হলে এদ্দিন কবে ছেলের মা হ'ত—তা নয়, এতবড় ধাড়ী মেয়ে, সিঁথেয় সিঁদুর নেই সাদা ফ্যাক্ ফ্যাক্ করছে, কি রকম বিশ্রী ঠেকে চোখে বলতো?

লতিকা মনে মনে হেসে ভাবলে—আহা! সিঁথেয় সিঁদুর দিলেই যেন মেয়ে মানুষের সব আকাঙ্ক্ষা সকল অভাব মিটে যায়।

বউকে ওপরে পাঠিয়ে সত্যবালা নিজের ঘরে বিশ্রাম নিতে

গেলেন। সুরেশের পায়ের শব্দ ছিল না, সে হয়তো ঘুমিয়েছে। লতিকা বড় মুস্কিলে পড়ল—শাশুড়ীর আদেশ অমান্য করা উচিত নয়—তাছাড়া ছোট বড় ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে তার নিজের মনও বিদ্রোহী হয়ে উঠছিল ক্রমশঃ, কেন? স্বামীর পরে তার কি এতটুকু অধিকার নেই? যেখানে অভিমান খাটবে না, সেখানে জোর করে আদায় করতে দোষ কি লজ্জাই বা কি? স্বামীর মঙ্গলের জন্য স্ত্রীকে মান অপমান সবই বিসর্জন দিতে হয় যে।

লতিকা বিপর্য্যস্ত দেহ মনকে কোনো মতে সামলে নিয়ে স্বামীর কাছেই যাচ্ছিল, কিন্তু ঘরের কাছাকাছি যেতেই তার কানে গেল বিনীতার কথা—

আরে যাও যাও! মশাই যে কত বড় সাধু পুরুষ তা জানাই গেছে—যে লোক প্রতিজ্ঞা করে রাখতে পারেনা—

কি! প্রতিজ্ঞা আমি রাখিনি! ওকথা বলো না বিনু! আমার সব ইতিহাস যদি শুনতে—

থাক্ দরকার নেই শুনে। চাক্ষুষ প্রমাণই কি যথেষ্ট নয়?

বিনীতার কণ্ঠস্বর অভিমানে গাঢ়।

লতিকার মাথা ঘুরে উঠল—সারা অঙ্গে কে যেন আগুন ছড়িয়ে দিলে। উঃ! এযে অসহ্য! অসহ্য!

সে আর কিছু শুনতে পেলে না, শোনবার চেষ্টা ও করলে না, অবশপ্রায় পা দুখানা জোর করে ফিরিয়ে নিয়ে খানিক এদিক্ ওদিক্ ঘুরে সে আস্তে আস্তে শাশুড়ীর ঘরে গিয়ে দেখলে তিনি ঘুমিয়েছেন। কতকটা স্বস্তি অনুভব করে লতিকা নিঃশব্দে সেখানেই একখানা বই হাতে করে বসে পড়ল—বসে উদ্‌ভ্রান্ত মনে ভাবতে লাগল—তার নিষ্ঠুর ভবিতব্যকে ঠেকিয়ে রাখা

যায় কি করে? ভাবনাটা যখন গভীর হয়ে উঠেছে, তখন নরেশ ভেজানো কাঠের ফাঁকে মুখ বড়িয়ে চুপি চুপি বল্লে—লতিকা তুমি এখানে! মা ঘুমোচ্ছেন বুঝি?

লতিকা স্বামীর পানে চকিতে চেয়ে, শশব্যস্তে মাথার কাপড় টেনে ঘাড় নেড়ে শুধু জানালে 'হ্যাঁ'—

তা হ'লে মাকে তুমি বলে দিও, বিনীতা আর বস্‌তে পারছে না ওর এবেলা অনেক কাজ, কে যে বলেছিল এসব হাঙ্গাম করতে! আমার ফিরতে দেরী হয় যদি, মাকে বলো ভাবনার কোনো কারণ নেই, কেমন?

এক মুহূর্ত্ত নির্ব্বাক স্তম্ভিত ভাবে থেকে লতিকা যখন নিজের ঘরে গেল নির্জ্জন ঘর খানা তখন বিরাট শূন্যতায় খাঁ খাঁ করছে! মর্ম্মাহতা লতিকার এতক্ষণকার কষ্টে চেপে রাখা নিবিড় ব্যথা অভিমান এবার উদ্বেল হয়ে দু'চোখ ছাপিয়ে ঝরে পড়ল ঝর ঝর করে।

হায়! কে এ মায়াবিনী তার প্রিয়তমাকে অন্তরের অন্তর থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় কোথায়? কোন্ অজানা গূঢ় গভীর রহস্যের ঘূর্ণাবর্ত্তে—

— ১২ —

বিনীতার হঠাৎ উদয় হওয়াটা লতিকার চোখে ভাল লাগে নাই। তার যেন আপনা থেকেই মনে হতে লাগল যে নরেশের সঙ্গে এর যেন কোথায় কি সূত্রে যোগ হয়েছে—সে যোগ ছিঁড়ে ফেলবার ক্ষমতা তার তো নেই-ই কারো আছে কিনা তাই সন্দেহ। বিয়ের আগেই নরেশ তার চারি দিকে এমন গণ্ডী দিয়ে রেখেছিল যে সেখানে সুশ্রী, সুরূপা, অপূর্ব্ব সুন্দরী লতিকার প্রবেশ এক রকম নিষেধ হয়েই পড়ল। আবার কোথা থেকে ধূমকেতুর মত ও এসে হাজির হল? পৃথিবীর কোন্ প্রান্তে লুকিয়েছিল, সেখান থেকে বেরিয়ে এসে আবার ওর ভাগ্য-গগনে একটা বিপর্য্যয় ঘটাতে ওকে যে ডাক্‌ল কে, এর সদুত্তর ভেবে ভেবে লতিকা কিছুই ঠিক করতে পারলেনা।

বিনীতাকে প্রথম সে যেদিন দেখে, সেদিনের কথা মনে পড়ল। নরেশ জেল থেকে ফিরবে। লতিকা মাঝে বাপের বাড়ী গিয়েছিল; ফেরবার সময় শিয়ালদা ষ্টেশনে দেখ্‌ল তাকে অপ্রত্যাশিতভাবে।

সুরেশ লতিকাকে নামাতে আস্‌ছিল। হঠাৎ প্লাটফরমের শেষ দিকে চেয়ে বল্লে "ওকে বিনীতাদি নাকি?"

ট্রেন তার শেষ গন্তব্য স্থানে এসে পড়ায় লতিকার over carried না-হবার সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে, যেখানে

কয়েকটী খদ্দর-পরা মেয়ে, কুলীর মাথায় নিজেদের মোট গুলি তুলে দিচ্ছিল সে সেইখানে গিয়ে হাজির হল। আর একটু এগিয়ে গিয়ে, চশমাটা বেশ করে মুছে নিয়ে সে বল্লে—"নমস্কার বিনীতা দি, আপনি কেত্থেকে!"

পিছন ফিরে দেখে নিয়ে একটী দোহারা গড়নের মেয়ে মুখে আশ্চর্য্য ও হাসি মাখিয়ে বল্লে "আরে কে? সুরেশ নাকি? ওঃ তুমি তো বড্ডই লম্বা হয়ে গ্যাছ দেখ্‌ছি—আমাকেও ছাড়িয়েছ যে! তার পর কি করছ?"

খুব নীচু স্বরে সুরেশ বল্লে "আমি তো এইবার 'এ্যপিয়ার' হব ভাব্‌ছি তা বোধ হয় ঠিক মত হয়ে উঠবেনা।"

"কেন? তৈরী হতে পার নি?"

"নাঃ! দাদা জেলে যাওয়ায় অনেক ফাঁক পড়ে গেছে।"

"ওঃ! নরেশ বাবু জেলে গেছেন? কেন অপরাধ?

"অপরাধ আর বেশী এমন কি? বক্তৃতা দিয়েছিলেন!"

"তাতেই ধরলে? তারপর বেরোবেন কবে?"

"বেশী দেরী নেই। ২।১ দিনের মধ্যেই বেরোবেন।"

"ভালই হল যোগা-যোগ আর বলে কাকে? এলাম যখন, তখন তাঁর সঙ্গে দেখা করেই যাব।"

"আচ্ছা আপনি এখন কোথায় থাকেন বিনীতা দি? করেনই বা কি?"

মুখে একটু হাসি এনে বিনীতা বল্লে "থাক্‌বার জায়গার বিশেষ কোনো স্থির নেই—যখন যেখানে পাই তখন সেখানে থাকি। কখন সরকারের অতিথিশালাতেও থাকি। দাদা ডেপুটী হয়েছে কিনা—তাই সেখানে থাকা তো আর আমার সম্ভব

নয়। আর করি, আপাততঃ অসহযোগ! তারই ফলে সকল দুয়ার বন্ধ থাক্‌লেও অতিথিশালা খোলাই থাকে। উদ্বাস্ত হয়ে উঠলেই সেখানে গিয়ে ঢুকি।"

"আপনি জেলেও গিয়েছেন?"

স্নিগ্ধ স্বরে বিনীতা বল্লে "এ আর নতুন কথা কি? এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে ভাই? আচ্ছা মাকে আমার কথা বোলো—একদিন গিয়ে দেখা করে আসব। আচ্ছা আসি।" বলে হেঁট হয়ে কুলীর মাথায় মোট তুলে দিয়ে তার সঙ্গে চলে গেল।

সুরেশ ধীরে ধীরে যে কামরায় লতিকা ছিল সেইখানে এসে দাঁড়াল। দেখলে ভেতরে লতিকা নেই। এতক্ষণ যে গাড়ীতে বসে থাক্‌বার কথা নয় তা বুঝতে পেরে, 'প্রাইভেট কার' যেদিকে থাকে, সেই দিকে পা বাড়াতেই তাদের দরোয়ান এসে ডাক্‌লে। তার সঙ্গে গিয়ে লতিকাকে গাড়ীতে বসে থাক্‌তে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে উঠে বসে গাড়ী চালাবার হুকুম দিলে। গাড়ী চল্‌তে আরম্ভ হল; সে বল্লে "আজ বিনীতাদির সঙ্গে দেখা—জানো বৌদি! সেই যে যার কথা তোমায় একদিন বলেছিলাম!"

একটু হেসে লতিকা বল্লে "তাই নাকি? আমি কিন্তু তা হলে তাকে চুরি করে দেখেও নিয়েছি। শুনে পর্য্যন্ত দেখার ইচ্ছে ছিল খুব। বিশেষ ভাল নয় তো দেখ্‌তে!"

"তা তো নয়-ই—বিশেষ তোমার কাছে।"

সত্যই—বিশেষ তার কাছে। সুরেশ ঠিকই বলেছিল।

সেদিনকার প্রত্যেকটী কথা তার সামনে যেন ফুটে উঠল।

অন্ধকারে বসে তার মনে যখন এমনিতরো হাজারও ভাবনা ঢেউ খেলে যাচ্ছিল, তখন চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়ে পাশের বাড়ীর সেই ঘর খানিতে বিজলী বাতি জ্বলে উঠ্‌ল। তার চোখ সেই ঘর খানিতে যেন আট্‌কে গেল। দেখ্‌লে বৌটী ঘরে আলো জালিয়ে, বিছ্‌না ঝাড়ছে। ঝাড়া শেষ হলে, কাপড়ের আলনাটা একটু গোছালে। তার স্বামী তখনও ফেরেনি—ছেলে গিয়েছে বেড়াতে, সেও ফেরেনি। ছেলের জামা, স্বামীর কাপড় সে যে কত প্রীতির সঙ্গে সাজিয়ে রাখ্‌লে তা লতিকা ঘরে বসেই অনুভব করলে। যেখানে যেটী রাখ্‌লে মানায়, ঠিক তেমনি করে রেখে বৌটী ঘরের ভেতরে যেন লঘুপক্ষ প্রজাপতির মত আনন্দ-চঞ্চল হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে, সে, তার নিজের হাতে সাজানো, গোছানো, পরিপাটী করে বিছানাপাতা ঘরখানির দিকে পরিতৃপ্তির সঙ্গে চেয়ে দেখ্‌লে। পরে আলো নিভিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল। লতিকার মনেও যেন এই ক্ষুধা জেগে উঠ্‌ল। বৌটীর ক্ষুধা আছে, সরস খাদ্যও আছে; কিন্তু তার? তার যে শুধু জীবন-ভোরই 'সাহারার' তৃষ্ণা বুকে চেপে নিয়ে বেড়াতে হবে! চোখ দিয়ে অনাহূত অশ্রু ঝরতে লাগ্‌ল—নিঃশব্দে।

একটু পরেই আবার সামনের ঘরে আলো জ্বল্‌ল। এবার বৌটী আর একা নয় কোলে তার ছেলে ঘুমিয়ে পড়েছে। সাবধানে, সন্তর্পণে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে, তার ছেড়ে-ফেলা জুতা ও জামাগুলি পাট করে রেখে দিলে। বিছানাতে কিছুক্ষণ বসে থেকে সে উঠে দাঁড়াল ও নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এবারে আর আলো নিভ্‌লনা।

দু'চার মিনিটও হবেনা, সে আবার ফিরে এল। এবারে তার স্বামীও ফিরেছে। তাদের মধ্যে যে কথা হচ্ছিল, তা খুব আস্তে আস্তে হলেও, রাত্রি বেলা ও জানালা দুটি খুব কাছাকাছি বলেই লতিকার তা শুন্‌বার কোন বাধা হলনা। সে শুন্‌লে বৌটী বলছে তার স্বামীকে "ভালই হল—আমি ভাব্‌ছিলাম ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়ল, কে যে ওর কাছে বসে এখন! অমনি তুমি এলে, এখন চট্‌ করে খেয়ে নিয়ে শুয়ে শুয়ে ছেলে পাহারা দেও, যতক্ষণ আমি না আসি! তার স্বামী একটুও রাগ না করে বল্লে "খাওয়া হয়ে গেলে আবার আসতে দেরী হবে কেন? কি কাজ করা হবে শুনি!"

মুখখানা ঘুরিয়ে বৌটী বল্লে "আহা! কথার ছিরি দেখ! ঘর সংসারের কাজ যেন একটা তাই আমি ওঁকে নাম করে সেটা বলব। কত কাজ থাকে তা জান! এখনও কি ছেলেমানুষ আছি নাকি আমি যে খেয়েই চুপ্‌ করে শুয়ে পড়্‌ব?" হাত বাড়িয়ে স্ত্রীকে কাছে এনে স্বামী তাকে ভেঙিয়ে বল্লে "আহা-হা-হা! একেবারে বুড়ো! দেখি তো দাঁত পড়েছে কিনা?" বলে সে তার মুখ খানাকে দুহাতে তুলে ধরলে।

এক ঝট্‌কায় তার হাত থেকে মুখ খানা ঘুরিয়ে নিয়ে বৌ বল্লে "কি রঙ্গ কর দিন রাত! ভাল লাগেনা।"

স্বামী তবুও ব্যঙ্গ ভরে বল্লে "একটুও ভাল লাগেনা? সত্যি বলছ? আচ্ছা যাক্। ভালমত বখ্‌শিশের আশা থাক্‌লে আমি ছেলের পাহারায় বস্‌তে পারি নইলে ব্যপার খাটা আমার কুষ্ঠিতে নেই।"

"ঈস্! মুখ খানি খুব আছে! আগে কাজ কেমন দেখি, তবে না, বখশিশ!"

"শোন, শোন, ও বাড়ীর নরেশ বাবু যে ফিরছেন।"

"ফিরছেন নাকি?" বলে বৌটী নরেশের বাড়ীর দিকে চেয়ে দেখলে।

তার রকম দেখে তার স্বামী হেসে বল্লে "তুমি কিচ্ছু খবর রাখনা কেবল বরটীকে আঁচলে বাঁধতেই ব্যস্ত! এই তো পাশের বাড়ীতেই নরেশ বাবুর স্ত্রী আছেন তাঁর সঙ্গে বোধহয় আলাপের চেষ্টাও করনি এতকাল! তা হলেই তো সব জানতে পারতে!"

ঠোঁট উল্টিয়ে সে বল্লে "ঈস্! খেয়ে দেয়ে আমার আর কাজ নেই কিনা তাই কে কখন্ জেলে গেল, কে কবে ফিরবে তারই হিসেব কস্‌তে বসি।"

"চটি কেন? ধরো, তোমার বরই যদি জেলে যায়! কি করবে?"

হঠাৎ চটে উঠে বৌটী বল্‌লে "যাবেই বা কেন? যাওয়ার যুক্তিসঙ্গত কারণ চাই তো একটা। বক্তৃতা দিয়েছ? না খদ্দর প্রচার করেছ? অম্‌নি বল্লেই বল? ও সব যারা দিন রাত হুজুগ কর্‌তে ভালবাসে—তারাই করে আর জেলে যায়।"

লতিকা জান্‌লায় বসে এর প্রত্যেকটী কথাই শুন্‌তে পেলে। ভাবলে "সত্যিই তো তুমি যে সুধা-সাগরে ডুবে আছ, তাতে অন্যের সুখ দুঃখের ভাবনা ভাববার সময় কই তোমার? তোমার স্বামী আছে, পুত্র আছে—তাদের স্নেহ মায়ায় গড়া ঘর সংসার আছে—তোমার সময় কই?" এই বৌটীর চোখে

নরেশের স্থান যে কোথায় ও কেমন, তা বুঝ্‌তে তার আর বাকী রইল না।

স্ত্রীর কথা শুনে স্বামী হেসে উঠ্‌লো—বল্‌লে "খুব বুঝেছ, বন্দীদের ওপর তোমার খুব সহানুভূতি! তোমার বর জেলে যাবেনা—কি জন্যে যাবে? চিরকাল তোমার আঁচলেই বাঁধা রইলো—নাও, এখন খেতে দেবে না ঝগরাই চালাবে?"

বৌটী এবারে উঠল। জলছড়া দিয়ে মেঝেটা পরিষ্কার করে মুছে ফেলে একখানা হাতে-বোনা কার্পেটের আসন পাত্‌লে। খাবার সবই তৈরী ছিল, শুধু লুচি কখানা গরম গরম ভাজবে বলে ষ্টোভ্‌টা জ্বাল্‌লে। 'প্রাইমাস্' ষ্টোভ, দু এক মিনিটের মধ্যেই ফোঁ ফোঁ করে গর্জ্জন করে উঠ্‌ল। কথা আর শোনা গেলনা; কিন্তু লুচি ভাজার গন্ধে ও মাঝে মাঝে তাদের সম্মিলিত হাসির শব্দে লতিকা বুঝ্‌লে যে খাওয়া এখনও শেষ হয়নি। জ্বালা-ভরা মন নিয়ে লতিকা দেখেই যেতে লগ্‌ল যে এত অফুরন্ত হাসি, গল্প ওরা পায় কোথা থেকে? স্বামীর প্রিয়া, সন্তানের মাতা, বৌটীকে তার কাছে মহিমাময়ী বলে মনে হতে লাগ্‌ল। তারও সেবিকা প্রাণ, এমনি করে কাউকে বুকের দরদ দিয়ে খাওয়াতে, তার প্রত্যেকটী তুচ্ছ অসুবিধাও দূর কর্‌তে উন্মুখ হয়ে উঠল। কিন্তু হায়! সে লোক কই?

লেখিকা—শ্রীহাসিরাশি দেবী

১৩

আঘাত স'য়ে স'য়ে পাথরেও বুঝি ফাটল্ ধ'রে, বুঝি বা চৌচিরও হ'য়ে যায়; কিন্তু মানুষের বুক ফাটে না, ভাঙ্গেও না, যেমন ছিল তেমনি থাকে, তেমনি সব কিছুই তাতে সহ্য হয়, তাই লতিকার বুকও ফাট্‌লো না, ভাঙ্গাতো দূরের কথা।

জানালার ওপোরে ভর দিয়ে সে উদাস দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ বাইরের দিকে চেয়ে রইল, তারপরে মেঝের ওপোরে শ্রান্ত ভাবে শুয়ে প'ড়ে একটা নিঃশ্বাস ফেললে—

"মাগো :—"

এতবড় সংসারের সমস্ত-কাজ, সমস্ত-ব্যবস্থার ভার যে প্রায় একা তারই হাতে, হয়তো সেই জন্যই এখনি ডাকও প'ড়তে পারে, একথা ভুলে গিয়ে সে ভাবতে সুরু ক'রলে কোথায় তার অতীত, কোথায় বর্ত্তমান, আর কোন অতল অন্ধকারে তার অনাগত ভবিষ্যৎ নিদ্রায় অচেতন!

ভবিষ্যৎকে আজ হাতড়েও দেখা পাওয়া যায় না বটে কিন্তু বর্ত্তমানকে স্পষ্ট দেখা যায়, আর ওরই সঙ্গে জড়িয়ে— উঠে আসে অতীতের জীর্ণ ইতিহাস!

সে ইতিহাস ছেঁড়া যায় না, জীবনান্ত পর্য্যন্ত লুপ্তও হয় না; সে চির জাগ্রত,—তাই বুকের মধ্যে রক্তাক্ষরে দিন রাত্রি জ্ব'লতে থাকে।



যদি মোছা যেত,—যদি তা ছেঁড়া সম্ভব হ'তো, তাহ'লে ওই ওরা দুজন,—যাদের নির্জ্জন আলাপের এতটুকু কথা ছিন্ন মেঘের মতো ভেসে এসে এক নিমেষে তার সমস্ত অন্তরটাকে কালি মাখিয়ে,—সকল সন্দেহের অবসান ক'রে দিয়ে গেল,—তারা কি তবে তাদের ব্যর্থ বাসনার শেষ সুরটুকুকে একেবারে নীরব ক'রে দিত না? হয়তো,—হয়তো কেন, নিশ্চয়ই দিত, কারণ—বঞ্চিত জীবন বহন করা যে কতখানি কষ্টকর তার সবটা না বুঝলেও কিছুও সে নিজের জীবনে বুঝেছে, আর বুঝেছে ব'লেই মনে হয়, সফলতার ক্ষণমাত্রও কাম্য, কিন্তু ব্যর্থতার দীর্ঘকাল লাভ মৃত্যুর অপেক্ষাও কঠিন শাস্তি, ও শাস্তির যেন মাপ নাই, প্রকাশের ভাষাও খুঁজে পাওয়া কঠিন। শুধু বুকের মধ্যে দিবানিশি ক্রন্দন করে কোন এক অজানা হতভাগ্য;—আর প্রতিক্ষণে বিপ্লবের সৃষ্টি ক'রতে চায় অপূর্ণতার আর্ত্তনাদ!

নরেশ বিনীতার কথার উত্তরে ব'লেছিল—

"আমার ইতিহাস যদি শুনতে—"

হাসি আসে। আনন্দের হাসি এ নয়, বিদ্রূপের। মনে হয় বলে—

"একা তোমার জীবনের ইতিহাস হয়তো বিনীতার কাছে মূল্যবান হ'তে পারে, কিন্তু আর কারো কাছে তার বিশেষ মূল্য আছে ব'লে মনে হয় না। বরং মনে হয় তোমার ও বিনীতার মাঝখানে এসে প'ড়ে,—না জেনে সে, এতবড় অন্যায় ক'রে ফেলেছে যে বুঝি তার আর প্রায়শ্চিত্ত নাই! তোমাদের এ পথ ছেড়ে যেতে পারলে সেও যেন একটা সুখের না হোক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচ্‌তো। একদিন তারও মনে সাধ

জেগেছিল,—আশার মন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে ভেবেছিল,—তোমার অতীতের ইতিহাস ছিঁড়ে ফেলে আবার নতুন ক'রে সে লেখা সুরু করাবে! কিন্তু কোথায় তুমি, আর কোথায় সে?

সন্দেহের যবনিকা আজ ভূলুণ্ঠিত!

ওপার স্পষ্ট দেখতে পেয়ে লতিকা যেন কাঁদ্‌বার শক্তি পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেল্‌লে। নিষ্ফল আক্রোশে মন তার আহত অজগরের মত গর্জ্জন ক'রে উঠ্‌লো—

কে কার? সেদিনও যখন স্বামীর মুখে "ভালোবাসি" কথাটা শুনে সে স্বর্গসুখ অনুভব ক'রেছিল,—সে কথা মনে হ'তেই কে যেন তার সমস্ত অঙ্গে আগুনের জ্বালা ধরিয়ে দিলে; ইচ্ছে হ'লো ছুটে গিয়ে টেবিলের ওপোর থেকে নরেশের ফটোখানা নিয়ে ছিঁড়ে ঐ পথের মাঝ-খানে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, বিপুল জনস্রোতের পদতলে তা দলিত হোক্, লুপ্ত হোক!

অন্তর্যামী বুঝুন, ললাটে তিনি যে বিদ্রূপ-লিপি লিখেছিলেন, সে তার কিছু শোধও নিয়েছে!

দরজা ভেজান ছিল; ওপাশ থেকে একটা মৃদু কণ্ঠস্বর কাণে এলো—

"বৌ-দি!"

"এসো।"

সমস্ত অবসাদ যেন এক নিঃশ্বাসে ঝেড়ে মুছে ফেলে লতিকা উঠে ব'স্‌লো; স্নান-সিক্ত চুল গুলো তখনও শুখায় নাই, তবু সে গুলো জড়িয়ে বেঁধে ফেললে। সুরেশকে প্রবেশ ক'রতে দেখে ইঙ্গিতে একখানা চেয়ার দেখিয়ে ব'ললে—

"বোস।"

মেঝের ওপরে ব'সে প'ড়েই সুরেশ প্রশ্ন ক'রলে—

"শুয়ে ছিলে যে?"

তার গলার স্বরটাও যেন আজ কেমন ধারা!

লতিকা দুইচোখে বিস্ময় ভ'রে সুরেশের দিকে তাকালো; শুষ্ক হাসি মুখের ওপোরে টেনে এনে উল্টো প্রশ্ন ক'রলো—"তোমার আবার হ'লো কি ঠাকুর পো?"

সুরেশও যেন চেষ্টা করেই হাসলে। উত্তর দিলে—

"আমার? আমার কিছুই তো হয়নি! কিন্তু মনে হয় তোমার—" একটু থেমে যেন স্বরের জড়তাকেই দূর করে প্রশ্ন করলো—"বল্‌ছিলাম যে, দিনের বেলায় শোওয়া তো তোমার কুষ্ঠিতে লেখেনি শুনেছি, তাই অসময়ে শোওয়ার কারণ জানতে চাচ্ছিলুম। অন্যায় হ'য়েছে?"

"অন্যায়?"

লতিকা যেন টেনে টেনে হাসতে লাগলো।

একটু-পরে হাসি থামিয়ে, মুখ তুলে সুরেশের দিকে চাইতেই মনে হ'লো ও যেন এতক্ষণ তারই দিকে চেয়ে ছিল; কিন্তু সে দৃষ্টিতে আর কিছু ছিল না, ছিল সমবেদনা জ্ঞাপনের ইচ্ছা।

লতিকা ডাকলো—

"ঠাকুর পো!"

সুরেশ চমকে মুখ ফিরালো—

"কি ব'লছো বৌ দি?

"না, বিশেষ কিছু বলবার নেই ভাই, শুধু জিজ্ঞেস করছি, যে এতক্ষণ কি তুমি পড়ছিলে?

"হাঁ, কেন?"

সুরেশের ব্যথা-ম্লান দৃষ্টির সম্মুখে মুখ তুলে কথা বলতে লতিকার কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল, একটু হেসে জবাব দিলে—

"কিছু নয়; আমি গিয়ে দরজা বন্ধ দেখে ফিরেছি কিনা তাই জিজ্ঞেস করছিলাম!"

সুরেশ দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে একটু বেঁকে বস্‌লো, উত্তর দিলে—

"কিন্তু আমিতো জানতে পারিনি, ফিরে এলে কেন? ডাকলেই তো পারতে!"

"ডেকেই বা কি হ'তো?"

শুষ্কস্বরে সুরেশ উত্তর দিলে—

"কিছুক্ষণ গল্প, আর কি!"

ক্ষণকাল নীরবে থেকে পরিহাসচ্ছলে লতিকা ব'লে উঠ্‌লো "অর্থাৎ তোমার পড়া কামাই, কেমন? কিন্তু সেটা ক'রে তোমার এখনকার মূল্যবান সময় নষ্ট ক'রতেও যে কষ্ট হয় ঠাকুর পো! ঐ কষ্টটুকু যদি না হোত তা হ'লে তো কথাই ছিল না! কিন্তু সব কাজের আগে শেষের ঐ যে ভাবনা, ঐটা অনেক খানি আনন্দ, অনেক খানি বেদনা মানুষকে এনে দেয়; আর ঐ জন্তেই আশঙ্কা বল, অনুশোচনা বল সব কিছুই মনের ওপোরে একাধিপত্য স্থাপন করে। কিন্তু তা ব'লে মনে ক'রোনা ঠাকুর পো, যে আমার অনিচ্ছায় ফিরে এসেছিলাম, ইচ্ছে একটা কিছু ছিল বই কি!"

সে নিঃশব্দে হাসতে লাগলো।

একটা কথা ব'লতে গিয়েও সুরেশ থেমে গেল, মুখ ফিরিয়ে

নিয়ে আজ যেন এই প্রথম ঘরখানাকে ভালো ক'রে দেখতে লাগলো।

পা-মোছা থেকে আরম্ভ ক'রে দেয়ালে খাটানো ছবিগুলো পর্য্যন্ত সবগুলোই যেন আজ তার কাছে সম্পূর্ণ নূতন।

ব্যঙ্গস্বরে লতিকা প্রশ্ন ক'রলো—

"কই, তোমার দাদা, বিনীতাদির কথা তো জিজ্ঞেস ক'রলেনা?"

"সুরেশ জবাব দিল—"জানি।"

"জান, তারা চ'লে গেছে? যাবার সময়ে দেখেছিলে? নির্ব্বাকে সুরেশ মাথা নাড়তেই একটু আগের মুখরা লতিকা যেন মুহূর্ত্তের জন্য ভাষা হারিয়ে ফেললে। দুর্ভাগ্যের ভোগ সহ্য করা যায়, কিন্তু তার চেয়েও কষ্টদায়ক হয় সেইটাই অন্যের মুখথেকে শোনা। লতিকার উদ্ধত মন এক নিমেষে আত্ম-অপমানের লাঞ্ছনায় নীড়-ভ্রষ্ট ভীরু-কপোতীর মত আর্ত্তনাদ ক'রে উঠেই নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

ওর রক্তশূন্য মুখের দিকে তাকিয়ে সভয়ে সুরেশ ডাকলে "বৌদি!"

কপালের দুপাশ টিপে ধ'রে অস্পষ্ট স্বরে লতিকা উত্তর দিলে—"হুঁ!"

হাত পাখা খানা টেনে নিয়ে হাওয়া ক'রতে ক'রতে ভীত স্বরে সুরেশ প্রশ্ন ক'রলো—

"কি হ'লো তোমার?"

হাত নেড়ে লতিকা জানালে কিছু হয়নি। একটু পরে যখন মুখ তুলে হাসলে তখন তার বড় বড় চোখ দুটো

অসহ্য যন্ত্রণায় লাল হ'য়ে উঠেছে। কপালের ওপোরে এসে পড়া ছোট ছোট চুলগুলোকে পেছ'নে সরিয়ে দিয়ে লতিকা ব'লে উঠলো "ভয় নেই, ম'রবো না; কিন্তু ঠাকুর পো, যদি আগে সবই জানতে তা হ'লে আমায় গোড়ায় বলনি কেন? আশা যখন ভেঙে যায় তখনকার যন্ত্রণা যে ব'লে বোঝাবার নয় ভাই!"

সুরেশের মুখে কথা ছিল না।

লতিকার মুখের হাসি কথা বলতে বলতে মিলিয়ে এসেছিল, আবার একটু হেসে যেন জোর দিয়েই ব'লে উঠ্‌লো—

"যাক—যা হয়ে গেছে তা আর ফেরান যায়না—, তার জন্যে দুঃখ করাও সাজেনা; কি বল!"

উত্তরের আশায় সে যার মুখের দিকে তাকালো তার মুখ থেকে এর একটা জবাবও এলোনা, শুধু নিঃশব্দে সে যে দিকে তাকিয়ে ছিল সেই দিকেই চেয়ে রইল, মুখও ফেরালে না।

সুরেশ নিরুত্তর!

ওর হাত থেকে পাখাটাকে নিয়ে পাশে রেখে লতিকা সোজা হ'য়ে ব'সলো, যেন কিছুই হয়নি এই ভাবে বলে উঠ্‌লো—

"এবার ওঠা যাক্, কি বল! বেলাও প'ড়ে এলো—," ও ঘর থেকে সত্যবালার ডাক এলো—

"বৌমা!"

"যাই মা!"

উঠে এসে লতিকা তাঁর সম্মুখে দাঁড়াতেই ব'লতে গেলেন "নরেশ, বিমুর জলখাবারটা—"

বাধা দিয়ে প্রসন্নমুখে লতিকা উত্তর দিলে—

"ওরা তো নেই মা!"

"নেই?"

বিস্মিত সত্যবালা পুত্রবধূর কথাটার পুনরুক্তি ক'রতেই লতিকা বলে উঠল—

"না, তাঁরা অনেকক্ষণ আগেই চ'লে গেছেন।"

সত্যবালার মুখে কথা ফুটলো না; পুত্রবধূর মুখের দিকে এমন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন যে লতিকার মুখ ধীরে ধীরে নত হ'য়ে প'ড়লো!

ঘরের মধ্যে সুরেশ তখন অস্থির চিত্তে দ্রুত পাদচারণা ক'রছিল।

১৪

সেদিন সন্ধ্যায় নিজের ঘরে ফিরেই বিনীতার মনে হ'লো এতক্ষণকার ধৈর্য্যের বাঁধ বুঝি এইবার এক নিমেষে ধূলিসাৎ হ'য়ে যায়।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘরের কোণে কোণে আধিপত্য বিস্তার ক'রলেও সে আলো জ্বাললে না; বরং দরোজা ভেজিয়ে দিয়ে বিছানার ওপোরে ক্লান্ত দেহ-খানা এলিয়ে দিলে।

বাসায় পৌছে দিয়েই নরেশ আজ ফিরে গেছে। বিনীতাও যেমন অন্য দিনের মত আজ তাকে আহ্বান করেনি, সেও

তেমনি আসে নি। যাবার সময় আর কথাও হয়নি, যেন প্রয়োজনও ছিল না এমনি ভাবে সে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল মনে হ'তেই বিনীতার সমস্ত মনটা যেন বিষিয়ে উঠ্‌লো। বিকৃত মনের চারিপাশে লতিকার অসামান্য রূপ যেন আবার নতুন ক'রে আগুন জ্বালিয়ে দিলে!

—নিজের ছন্নছাড়া জীবনের সঙ্গে এই বধূটির সুখময় গার্হস্থ্য জীবনের মিল যে কতটুকু এইটাই ভাবতে ভাবতে মন তার এমন স্থানে এসে উপস্থিত হ'লো যেস্থানে নরেশ নাই,—দেশ নাই, কাজ নাই, আছে শুধু সে আর লতিকা। পথ তাদের দুজনেরই ভিন্ন। তাই লতিকা বসে আছে সংসারের ছায়াময় উদ্যানে, স্বামী ও তার ভাবী পুত্র কন্যা বেষ্টিত হ'য়ে আর সে বসে আছে রৌদ্র তপ্ত মরুর বক্ষে একা। অশান্তির তৃষায় সে কাতর তবু ঐ অদূরবর্ত্তিনী লতিকার কাছে এক ফোঁটা শান্তি বারি চাইবার মত তার শক্তি নাই। কারণ দানের ক্ষমতা ওর থাকলেও নেবার ক্ষমতা তো বিনীতার নেই। দাতা দান ক'রতে পারে, কিন্তু নেবারও শক্তি থাকা চাই যে! নরেশ ওর স্বামী, তার কে? ক'দিনেরই বা পরিচয়?

আকর্ষণ ওর হয়তো দুদিনের হ'তে পারে,—মোহও হয়তো কেটে গেছে, কিন্তু বিনীতা যে আজও কিছু ভোলেনি! মন যে মাঝে মাঝে অশান্ত এই কর্ম্ম কোলাহল কাটিয়ে বিবাগীর মত একখানা শান্তিময় কুটীরের মধ্যে ছুটে যেতে চায়, দুঃখে সুখে মুখো-মুখি কপোত-কপোতীর মত প্রিয়তমের বুকে সোহাগ নীড় রচনা ক'রতে চায়!

দু' ফোঁটা চোখের জল যে কখন গড়িয়ে মাথার বালিশে

পড়েছিল সেদিকে তার খেয়াল ছিল না, হঠাৎ বাইরে থেকে বাসার কর্ত্রী করুণাদির ডাক তাকে সচকিত ক'রে তু'ললো—

"বিনীতা—"

তাড়াতাড়ি মুখখানাকে মুছে ফেলে বাইরে এসে দাঁড়াতেই দেখলে করুণা একখানা খামে মোড়া পত্র হাতে নিয়ে তারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। তাকে আসতে দেখেই ব'লে উঠ্‌লেন—

"তোমার একখানা চিঠি আছে"

"চিঠি!"

হাত বাড়িয়ে নিয়ে বিনীতা দেখলে দাদার লেখা, তারই পত্র। হাতের মধ্যে চিঠিখানা রেখে সে মুখ তুলে একবার করুণার দিকে দৃষ্টি পাত ক'রলো—

"ঘরে আসবেন না?

"না, একটু কাজ আছে।"

ব'লে চ'লে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েও করুণা ফিরে প্রশ্ন ক'রলেন—

"তোমার শরীর কি অসুস্থ? ঘরে আলোও তো আলোনি দেখছি!"

বিনীতা শুষ্কহাসি হাসলো; সহজ স্বরে উত্তর দিল—

"না, অসুখ বিশেষ কিছু নয়, মাথাটা ধ'রেছিল, এখন ছাড়ছে ব'লে আর আলো জ্বালিনি!"

চটির চটাপট শব্দ ক'রত ক'রতে করুণা-দি বারান্দা ঘুরে অদৃশ্য হ'তেই বিনীতা ঘরে প্রবেশ করে আলোর সুইচটা টিপে দিতেই সমস্ত ঘরটা আলোকোজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌লো। চিঠিখানা খুলে বিনীতা দেখলে নানা কথার মাঝখানেও দাদা যেন তাকেই

বারম্বার ফিরে যেতে অনুরোধ ক'রেছেন! লিখেছেন,—"রাগ বা অভিমান বড়'র ওপোরে করা যায় সত্য, কিন্তু ডাকলে ফিরেও আসতে হয়।"

রাগ? অভিমান? দুঃখ?

হ্যাঁ সে একদিন ভাইয়ের ওপোরে অভিমান ক'রেই চ'লে এসেছে বটে, যেদিন দাদা তাঁর বাল্য বন্ধু অমিয়র সঙ্গে তার বিবাহের ইচ্ছা জানিয়েছিলেন এমন কি জোর জানাতেও তাঁর বাধেনি, সেদিন সে অনিচ্ছা জানিয়েও পরিত্রাণ পাবেনা জেনেই ঘরের সকল বাধা জোর ক'রে ছাড়িয়ে বাইরের এই মুক্ত হাওয়ায় এসে দাঁড়িয়েছিল। তারপরে আজ কতদিন, কত মাস, কত বৎসর চ'লে গেছে তার সংখ্যা ঠিক তার মনে না প'ড়লেও তারপরে দাদার আহ্বান যে আজ এই প্রথম, ফিরে যাবার ডাকও যে এই প্রথম, একথা মনে হ'তে এত দুঃখেও তার হাসি এলো।

মানসচক্ষের সম্মুখে গত জীবনের কয়েকটি ছবি ভেসে উঠ্‌লো—মায়ের অসুখ, নরেশদের পাশের বাড়ী ভাড়া নেওয়া, —ওদের সঙ্গে পরিচয়; তারপর···তারপর আরও কত কি!

মাঝের কয়েকটা বৎসরের সুখস্মৃতি এখনও উন্মনা ক'রে তোলে! শেষের বৎসর কয়টার কথাও মনে পড়ে...জেলখানা! ···পথ···!

জীবনের পথে কত কে এসেছে, গেছেও, কে তার হিসাব রাখে! দুনিয়ার নিয়ম যখন এই-ই, তখন এ নিয়ম ভাঙবার ক্ষমতা মানুষের নেই।

বিনীতাও মানুষ! রক্ত মাংস গঠিত দেহে ভগবান তারও

প্রাণ প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন, কাজেই তারও এ নিয়ম ভাঙ্গবার মত ক্ষমতা নেই! গতানুগতিতে পা ফেলে তাকেও চ'লতে হবে!

খোলা জানালা দিয়ে বিনীতা বাইরের দিকে চাইলো; বড় বড় বাড়ী, প্রশস্ত রাজপথ, বিপুল জনস্রোতের মধ্যের এক জনকেও তার আপন ব'লে মনে হ'লো না, সব যেন সাজান, সবাই যেন পর, যন্ত্র চালিতের মত ওরা যে যার কাজে যাচ্ছে আসছে। যেন তার অদৃষ্টকে বিদ্রূপ ক'রেই ঐ প্রকাণ্ড বড় বড় বাড়ী গুলো, রাজপথ, জনস্রোত প্রাণভ'রে হাসা-হাসি ক'রছে!

বিনীতা চোখ ফিরিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো; ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে খোলা ছাদের ওপোরে এসে দাঁড়াইতেই মুক্ত আকাশের শেষ রক্তিমচ্ছটা এসে তার সর্ব্বাঙ্গে ছড়িয়ে প'ড়লো; শুনলো ওপাশের বাড়ীতে কে গাচ্ছে—

"হেরে কমল মৃণালে কেউ কাঁটা, কেউ কমল,—
কেউ ফুল দলি' চলে কেউ মালা গাঁথে নিতি।"

মনের মধ্যে নরেশের মুখটা যেন স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্লো। ওর সমস্ত সৌন্দর্য্য, গুণ, অর্থ-সম্পদ যেন তাকে এক সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিলে বিনীতা তার কাছে কতখানি ছোট! কতখানি অযাচিত ভাবে সে তাকে একদিন কাছে পেয়ে স্তোক-বাক্যে ভুলিয়েছিল সে তাকে ভালবাসে, জীবনান্ত পর্য্যন্ত এ ভালোবাসার স্মৃতি ওর বুক থেকে মুছবেনা! বিনীতার সর্ব্বশরীর যেন একবার নিজের ওপোরে গভীর ঘৃণায় শিউরে উঠলো। শুনলে সে গাচ্ছে—

"কেউ জ্বালেনা আর আলো তার চির দুখের রাতে,—
কেউ দ্বার খুলি জাগে চায় নব চাঁদের তিথি!"

* * * *

ঠিক এমনি সময়েই দূরের একটি ঘরে ব'সে অন্যমনস্ক নরেশ চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে মুখ তুলতেই দেখলে লতিকা কখন ধীরে ধীরে এসে দরোজার ওপোরে দাঁড়িয়েছে, দৃষ্টি তারই মুখের ওপোরে আবদ্ধ!

চ'মকে উঠে নরেশ প্রশ্ন ক'রলে—

—"তাকিয়ে আছ যে?"—

মুখটাকে একবার নত ক'রে লতিকা আবার তাকালে, একটা ঢোক গিলে উত্তর দিলে—

"কিছু নয়।"

"কিছু নয়? তবে?..."

"এমনি,—তোমাকে দেখছিলাম!"

অদ্ভুত উত্তর!

নরেশ কিছুক্ষণ স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে; চা খাওয়া হ'য়ে গিয়েছিল, কাপটাকে টেবিলের ওপোরে নামিয়ে রেখে নরেশ আবার ফিরে তাকালো। ডাকলে "শোন!"

লতিকা ধীরপদে নিকটে এসে দাঁড়াতেই তার অসংযত রুক্ষ চুলের দিকে চেয়ে প্রশ্ন ক'রলো—

"চুল বাঁধোনি?"

লতিকা ব'সে প'ড়লো। একটু হেসে উত্তর দিলে—

"না। কিন্তু তোমার প্রশ্নটাকে আজ হঠাৎ নতুন ব'লে ম'নে হ'চ্ছে।" তার কণ্ঠস্বরে যে বিদ্রূপ ধ্বনিত হ'য়ে উঠলো তা নরেশের অজানা রইল না, কিন্তু সে তাতে অপ্রস্তুতও হ'লোনা; হয়তো হাসি দিয়ে সমস্ত অপ্রতিভতাকে ঢেকে ফেলে সে সহজ স্বরে উল্টো প্রশ্ন ক'রলো—

"হঠাৎ মনে হবার কারণ ?"

কারণটা মুখে এলেও লতিকা সেটাকে মুখের বার ক'রতে পারলে না, একটু এদিক ওদিক ক'রে চঞ্চলস্বরে ব'লে উঠ্‌লো—

"কাজ আছে, যাই।"

নরেশ বারণ ক'রলে না, একবার মুখ তুলে ওর দিকে তাকাতেই মনে হ'লো ও যেন ইচ্ছে ক'রেই মুখটা ফিরিয়ে নিচ্ছে! নরেশের দৃষ্টির সম্মুখে লতিকার ঐ মুখ ফেরাবার ভঙ্গিটুকু যেন অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য নিয়ে দেখা দিল—ওর অভিমানে ছল ছল চোখ দুটোর গোপন ভাষা স্পষ্ট করে ওকে গভীর লজ্জায় ফেলার ইচ্ছেটা তাকে মুহূর্ত্তের জন্য সব ভুলিয়ে দিলে; হঠাৎ দুই হাতে লতিকার মুখখানা তুলে ধ'রেই সে হেসে উঠলো—

"আরেঃ—যাও কোথায় ?"

লতিকার চোখের কোণে যে দুই ফোঁটা জল ছল ছল ক'রছিল, সেটা গড়িয়ে প'ড়তেই সে মুখ সরিয়ে নিলে—

"যাওঃ—"

হঠাৎ দুই হাতের মধ্যে মুখ ঢেকে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌লো।

বিস্মিত, স্তম্ভিত নরেশ প্রথমে কান্নার কারণ কিছু বুঝতে পারলো না, তার পরে বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে যখন লতিকার মাথার ওপোরে ধীরে ধীরে নিজের ডান হাতখানায় স্পর্শ ক'রলে তখন ওর কান্নার প্রথম বেগটা থেমে এসেছে।

নরেশ শান্তকণ্ঠে ডাকলে—

"লতিকা!"

লতিকা মুখ তুলবার চেষ্টা ক'রলেও পারলে না, উত্তর দিল

"কেন ?"

একটু ইতঃস্তত ক'রে নরেশ প্রশ্ন ক'রলে—

"আমার ব্যবহারে দুঃখ পেয়েছ?"

যেন আরও অনেকগুলো বলবার মতো কথাই সে চেপে গেল এ খবর ব্যথাহত লতিকার কাছেও অজানা রইল না; নতমুখে সে উত্তর দিলে—

"না।"

নরেশ ওকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে ওর রুক্ষ অসংযত চুলগুলোর ওপোরে হাত বুলোতে বুলোতে প্রশ্ন ক'রলে—

"তবে?"

"তবে কি?"

"কাঁদলে কেন?"

"এমনি।"

"কিন্তু এমনি তো কেউ কাঁদে না!"

লতিকা নির্ব্বাকে নরেশের বাহুর ওপোরে মাথা রেখে অনুভব ক'রতে লাগলো ওর স্পর্শটুকু!

কতক্ষণ যে এমনি নীরবে কেটেছিল সে হিসাব কারও ছিল না, হঠাৎ দেখলে ঘড়িতে ঢং ঢং শব্দে সাত্‌টা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে দু'জনেই চমকে উঠ্‌লো। নরেশ পুনরায় প্রশ্ন ক'রলে "কই, ব'ললে না?"

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে গিয়ে লতিকা উত্তর দিলে—

"কিন্তু ব'লে লাভ?"

নরেশের ওষ্ঠাধরে ম্লান হাসি ভেসে উঠ্‌লো; উত্তর দিলে "না হয় ক্ষতির ভারটা আমিই নেব এখন।"

লতিকা শুধু নিরুত্তরে নরেশের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল;

নরেশও ব'লবার মত যেন কোনও কথা খুঁজে পেলে না। শুধু ওর বড় বড়,—সরলতা ভরা চোখ দুটোর দিকে চেয়ে যেন আজ তার প্রথম স্মরণ হ'লো, সে বিনা অপরাধে,—শুধু নিজের শান্তির দিকে চেয়ে এই বালিকাটিরই সর্ব্বনাশ ক'রেছে। ইহ-জগতে সে আর কখনো, কারো কাছে, কিছুর বিনিময়েই শান্তির অধিকারিণী হবে না; সুখী তো নয়ই। একা তারই অবহেলায় ওর জীবনটা অসময়ে শুকিয়ে উঠবে, দয়ার পাত্রী হিসাবে শ্বশুরালয়ে অথবা পিত্রালয়ে হোক্ যেখানে আশ্রয় পাবে সেখানে থেকেও সমস্ত জীবনভ'র ব'ইতে হবে শুধু অবহেলা,—ঘৃণা!

কারণ—সে স্বামীর যত্ন পায় নাই, এই দুর্ভাগ্যের জন্য।

অনুশোচনার তীব্র কশাঘাতে নরেশ চ'মকে উঠ্‌লো। মনে হ'লো কে যেন দুই হাতে তার হৃৎপিণ্ডটাকে নিংড়ে সমস্ত রক্ত বার ক'রে নিচ্ছে!

মুখটা ক্ষণিকের জন্য বিকৃত হ'য়ে উঠলো। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে সে ব'ললে—

"আমিও সব বুঝি লতিকা, আমিও মানুষ!"

একটু থেমে, একটা ঢোক গিলে পুনরায় ব'লতে সুরু ক'রলে "কিন্তু তুমি যদি আমার মত অবস্থায় প'ড়তে, তাহ'লে বুঝতে যে, মানুষ ইচ্ছে ক'রেই তার সুখ শান্তি যা কিছু নিয়ে কেমন ছিনি মিনি খেলছে! হাসি মুখে এদের যেমন দুঃখের আঘাতও বুকপেতে নিতে হয়, তেমনি সুখের আতিশয্যটাও সময়ে সময়ে অসহ্য-বোধে দূর ক'রে দিতে চায়।"

লতিকা নির্ব্বাক; তার মুখের দিকে চেয়ে নরেশ ব'লে

উঠলো "জানি, তোমার অধিকার, তোমার দাবী তুমি চুল চিরে বখরা ক'রে নিতে চাও, নিজের আধিপত্যও বিস্তার ক'রতে চাও আমার ওপোরে, কারণ তুমি আমার স্ত্রী; তোমার ওপোরে যেমন লোকাচার হিসাবে আমার দাবী, আমার অধিকার বজায় থাকবে তেমনি আমার ওপোরেও তোমার কিছু কম থাকবেনা, এইটাই তুমি চাও, কিন্তু লতিকা, লৌকিক আচার অনুষ্ঠান ছাড়াও যে আরও একটা কিছু আছে সেটা মানো কি?"

লতিকার দুই চোখ জলে ভ'রে উঠেছিল; অস্ফুটে ব'ললে "থাক্।"

মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে একটু অসহ্য ভাবে নরেশ ব'লে উঠলো, "না আজ আর "থাক্" নয়! যা এতদিন তোমার কাছে থেকে লুকিয়ে বেড়িয়েছি তা আজ তোমার সম্মুখে স্বীকার ক'রেই আমি খানিকটা নিশ্চিন্ত হতে চাই; এমন ক'রে দিনরাত লুকোচুরীর খেলা আমি আর খেলতে পারছিনে লতিকা, আমার সমস্ত চেতনা যেন দিন দিন অবসাদে জড়িয়ে আসছে; আমি আজ সব বলতে চাই, বাধা দিওনা—।"

মৃদুস্বরে লতিকা উত্তর দিলে—

"কিন্তু,—আমি সব জানি!"

"জানো?"

একবার চমকে চেয়েই নরেশ পুনরায় চোখ বন্ধ ক'রলো, কিন্তু ক্ষণিকের জন্য; একটু চুপ ক'রে থেকে ব'লে উঠ্‌লো "তবু ব'লবো, তুমি না শুনতে চাইলেও আমি শোনাব যে আমি,—আমি বিনীতাকে ভালোবাসি!

একটা বিরাট নিস্তব্ধতায় ঘরটা যেন পূর্ণ হ'য়ে উঠলো ; যেন এর পরে আর কারও কইবার মত কোনও কথাই রইলনা,— এক নিমেষে ফুরিয়ে গেল।

শতধা বুকখানাকে দুইহাতে চেপে ধ'রে লতিকা উঠে দাঁড়ালো—

"ওগো—"

অচেতনের মত নরেশ শুধু উত্তর দিলে—

"হুঁ !"

লতিকা আবার ব'সে প'ড়লো। নরেশের হাতদুখানাকে নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে ব'লে উঠ্‌লো—

"একটা কথা তবু জানতে ইচ্ছে হয় !"

"বল।"

"বিনীতাকে বিয়ে করনি কেন ?"

নরেশের ওষ্ঠাধরে ম্লান হাসির রেখা ভেসে উঠলো ;

ক্লান্ত দৃষ্টিতে লতিকার মুখের দিকে চেয়ে উত্তর দিল—

"নানা কারণে।"

লতিকা নিজের অজ্ঞাতেই বোধহয় নরেশের হাত দুখানা শক্ত ক'রে ধরেছিল, ছেড়ে দিয়ে হঠাৎ কাঙালের মত বলে উঠলো—

"আমার একটা অনুরোধ রাখবে ?"

"কি ?"

"তুমি বিনীতাকে বিয়ে কর।"

নরেশ অস্বাভাবিক রকম চমকে উঠলো।

হয়তো এতটা শুনবার আশ সে করে নাই,—তাই তার

চোখ দুটোও যেন মুহূর্ত্তের জন্য জল্ জল্ ক'রে উঠলে—চকিতে লতিকার হাত দুখানাকে শক্ত ক'রে ধ'রে একটা ঝাঁকুনী দিয়ে সে বলে উঠলো—

"কিন্তু তুমি সহ্য ক'রতে পারবে লতিকা ?...পারবে ?" হাত ছাড়িয়ে নিয়ে লতিকা উঠে দাঁড়ালো ; দরজার দিকে অগ্রসর হ'তে হ'তে উত্তর দিলে "পারবো ।"

নরেশ বলে উঠলো—

"কিন্তু এই পারানোর'ও তো একটা অধিকার চাই, আমি যদি না তোমার কথামত কাজ ক'রতে পারি ?"

লতিকার তরফ থেকে কোনও উত্তর এলোনা, সে দরোজা পার হ'য়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো, একটু পরে দ্রুতপদে বারান্দা অতিক্রম ক'রতে ক'রতে শুনতে পেলে নরেশ ডাকছে—

"শুনে যাও লতিকা,—বেশী নয়, আর একটা কথা —" ইচ্ছে থাকলেও লতিকা ফিরতে পারলো না, বিশ্ব সংসার তখন তার দৃষ্টির সম্মুখে আলো আঁধারের মাঝখানে দোল খাচ্ছিল......।

— ১৩ —

দিনের আলো যখন ধীরে ধীরে মিলিয়ে আসছিল, সন্ধ্যার কালিমা ধীরে ধীরে ফুটে উঠছিল, তারই পানে তাকিয়ে বিনীতা ভাবছিল দূর অতীতের কথা।

সাম্‌নে খোলা পড়েছিল নরেশের পত্র-খানা, খানিক আগেই বেয়ারা হাতে করে এনে দিয়ে গেছে!

আশ্চর্য্য জগৎ আর আশ্চর্য্য এর অধিবাসীরা, এদের সম্বন্ধে ঠিক কিছুই জানা যায় না, মানুষ অথচ মানুষের সম্বন্ধেই ভাবে এই জগতেই বাস করে—তবু সে বরাবরই মানুষের সম্বন্ধে অজ্ঞ থেকে যায়।

নিজের অক্ষমতার দরুণ নিজেকে সে কোন দিনই দোষী করে নি, অনায়াসে দোষ চাপিয়ে দেয় ভগবানের মাথায়, কেননা বেশ জানা যায় তিনি কোনদিন নিজের সাফাই গাইতে আসবেন না।

বিনীতাও তাই ভাবছিল:দোষ কার, তার না নরেশের অথবা ভগবানের? যদি সম্ভব হ'তো অতীতটাকে মুছে দেওয়ার তা হলে বিনীতা যে কতখানি সুখী হতো তা আর বলবার নয়।

সে কাল যে দিনটী গেছে সেটীকে পর্য্যন্ত মুছে ফেলে দিতে পারলে বাঁচে, কেবল নিজের কাছ হতে নয়, নিজের বুক হতে নয়, আরও একজনের বুক হতেও অতীতটাকে মুছতে চায়।

মনের মধ্যে জেগে উঠছে একটা দিনের কথা যে দিন সে

হয়তো নিজের অজ্ঞাতেই একটা সুখ-নীড়ের কল্পনা করেছিল, কাউকে সঙ্গীরূপে পাওয়ার কল্পনা করেছিল।

আজ মনে করতে সারা মন তার বিষিয়ে ওঠে,—ছিঃ, সেদিন সে কি কল্পনা করেছিল, কি চেয়েছিল। অনাগত কোন একটা দিনকে সে পাওয়ার প্রর্থনা করেছিল, তার 'পরে নিজের বাসনা কামনা ঢেলে দিয়ে সে আশার জাল বুনেই চলেছিল।

সে হয় তো রাতের স্বপন। আঁধারে দুনিয়া যখন ঢেকে যায়, মানুষ তখন বিছানায় শুয়ে চোখ মুদে অনেক কিছুই ভেবে থাকে, ঘুমিয়ে পড়ে অনেক কিছুই দেখে থাকে।

তার পরে—দিনের আলো যখন ধরার বুকে ছড়িয়ে পড়ে—মানুষ তখন তাকিয়ে দেখে, গত রাতের স্বপ্নের কথা মনে পড়ে যায়—নিজেই সে কুণ্ঠিত হয়ে ওঠে। দিন যা নিয়ে আসে সেইটাই চরম সত্য, রাতের স্বপ্ন তখন নিতান্তই তুচ্ছ বলে হয়, তার মূল্য তখন বিন্দুমাত্রও থাকে না।

অজ্ঞাতে তার মন চেয়েছিল কাকে—বুঝতে পেরেছিল সেইদিন যেদিন সে সামনে দেখতে পেলে লতিকাকে। সেই মুহূর্ত্তে তার মনে হল তার চারিদিকে যে কুহেলী-জাল বিস্তৃত হয়েছিল হঠাৎ তা ছিঁড়ে গেল।

তবু তার মত মেয়ে বলে তখনই নিজেকে সামলে নিতে পেরেছিল, আবার ঠিক আগের মতই ওদের বাড়ীর সকলের সঙ্গে মিশেছিল, তেমনি হেসেছিল, তেমনই ছুটোছুটি করেছিল। কেউ পাছে তাকে চিনতে পারে এই ভয়টাই তার মনের মধ্যে জেগেছিল, সেই জন্য সে হয় তো সেদিনে অনেক বেশীবারই হেসেছিল।

নরেশ সেদিন যখন তাকে পৌঁছে দিয়ে নীরবেই চলে গেল, সেও নীরবে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করলে, সেদিনও সে ভাবেনি নরেশদার মনে এ রকম চিন্তার উদয় হয়েছে।

কিন্তু এ চিন্তা তো নূতন নয়। নরেশ যে তাকে ভালোবাসে তা তো সে জেনেছে। এক দিন তারা প্রতিজ্ঞা করেছিল তারা কেউ বিবাহ করবে না, দুজনে কেবল দেশের কাজ করবে। সে আজও নিজের কাজ করে যাচ্ছে, নরেশদাকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে হয়েছে। সে বিবাহ করেছে বাধ্য হয়ে—তবু দেশের কাজ সে করছে।

নরেশদাকে বিবাহিত জেনে সে প্রথমটায় সত্যই বড় মুসড়ে পড়েছিল, একবার চোখ তুলে তার পানে চেয়েছিল, নরেশ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। বিনীতা লক্ষ্য করেছিল তার সে মুখে ফুটে উঠেছিল বড় করুণ অসহায় ভাব। তারপর নরেশ জানিয়েছিল কি রকম ভাবে তাকে বিয়ে করতে হয়েছে।

আঘাতের ব্যথাটা বড় বেশী অনুভব হয় যখন সেটা এসে পড়ে, তারপর সবই সয়ে যায়। প্রথম বেদনাটা কেটে গেলে দ্বিতীয় বারের বেদনা আর তত প্রবল নাও হতে পারে। বিনীতাও চট করে নিজেকে সামলে নিয়েছিল, নিজেকে নরেশের কাছ হতে একটু তফাতে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

দুদিন আগেও নরেশের সঙ্গে তার ক্ষণিকের দেখা হয়েছিল গিরীশ পার্কে, নরেশ যেন পাশ কাটিয়ে গেল বলে মনে হল। বিনীতা সে দিন মিনিট পাঁচেক স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তার পর জোর করে সে অবসাদটা দূর করে ফেলে আবার নূতন উৎসাহ এনে কাজে অগ্রসর হয়েছিল।

রাত্রে শান্ত ভাবে বিছানায় শুয়ে সে ভেবেছিল তফাতে থাকাই ভালো। মানুষের মনের গতি চিরদিন হয় তো সমান থাকতে পারে না। অনেকদিনের ছুটাছুটির পরে তার চঞ্চল মনও একদিন শান্ত হয়ে বিশ্রাম নেওয়ার কল্পনা করেছিল। সে যে ভুলে করেছিল,—সে শান্ত সংযত হতে চায় না, এই রকম উদ্দাম গতিতে সে চলুক, তার জীবনের পরিসমাপ্তি অশান্তির মধ্যেই হোক।

এরই মাঝে সে শান্তি পেতে চাইছিল, মৃত্যুর বিভীষিকার মাঝে সে জীবনের রূপ পরিকল্পনা করছিল, হঠাৎ নরেশের এই পত্রখানা এসে পড়ে তার চিন্তা ধারার গতি উলট পালট করে দিল।

একবার পড়ে বিশ্বাস হয় নি তাই সে বার বার সেই পত্রখানা তুলে নিয়ে পড়ছিল।

এ ও কি সম্ভব—নরেশ তাকে জীবনের সহচারিণী করতে চায়, তাকে পাশে টেনে নিতে চায়? কিন্তু তার যে স্ত্রী আছে, সে তো একটী মেয়েকে সহধর্ম্মিণী সহচারিণী বলে গ্রহণ করেছে?

নরেশ লিখেছে—যদিও তার স্ত্রী অনুপম সুন্দরী তবু সে সুখী নয়, কারণ, সে একে চায় নি, লোকে বলে পুরুষ সুন্দরী স্ত্রীকে ভালো বাসবেই, কিন্তু নরেশ এ কথা স্বীকার করতে চায় না। রূপ চোখের নেশা বাড়িয়ে তোলে, মানুষ তাই রূপের নেশায় মাতাল হয়ে ছোটে, কিন্তু যখন নেশা ছুটে যায়? সংসারে নেশা জিনিসটা কিছুই নয়, একেবারেই মিথ্যে, তাই সে একদিন মিলিয়ে যাবেই,—সেদিনে মোহ, ভ্রান্তি কিছুই

থাকেনা, জেগে থাকে যা সত্য তাই,—সেই গুণের পাশে বদ্ধ হওয়া, সেই চিরন্তন সত্য।

পত্রটা পড়ে বিনীতা ভাবছিল সত্যই কি এ কথা ঠিক—কিন্তু অবিশ্বাসও তো করা চলেনা। লতিকাকে সে যদি না দেখত, নরেশের পরিচয় যদি সে না পেত হয় তো তার মনের ভ্রান্তি চিরকাল সমভাবেই থেকে যেত।

আজ সে প্রথম যেন বিশেষ করেই নিজের পানে চাইলে।

তাই তো—কি আছে তার, কিছু নাই—কিছু নাই। লতিকার পাশে দাঁড়ালে তার পানে কারও চোখ পড়বে না—তবু—তবু নরেশ কেন তাকে ভালবাসে—কি দেখে সে মুগ্ধ হল?

বিনীতা শিউরে উঠল,—নরেশের পাশে সে, ছিঃ, মানায় কি? কোথায় নরেশ আর কোথায় সে, মাঝখানে অনন্ত অসীম ব্যবধান। না না, যে কল্পনায় মন তার শিউরে উঠ্‌ছে, সে কল্পনাকে সে সত্যে পরিণত দেখতে চায় না।

"বিনীতা—"

বাইরে ডাকছিল রেখা তার সহকর্ম্মিণী। তাড়াতাড়ি সামনের পত্রখানা সরিয়ে ফেলে বিনীতা উত্তর দিলে—

"এসো।"

এনভেলাপখানা যে সামনেই পড়েছিল তাড়াতাড়ি তা মনে হয় নি। রেখা ঘরে প্রবেশ করতেই তার চোখে সেখানা পড়ল, একটু হেসে এনভেলাপটা তুলে নিয়ে বললে, "এ চিঠি কোথা হতে এল বিনীতা?"

বিনীতা অকারণেই লাল হয়ে উঠল, বললে, "কোথা হতে

আবার? কেন, পত্র দেওয়ার লোক কেউ থাকতে পারে না কি? বাপ রে, একটা এনভেলাপ দেখে অমনি মনের মধ্যে হাজার কথা জেগে উঠেছে। কি মন যা হোক, আনাচে কানাচে কেবল রোম্যান্স খুঁজে বেড়ায়।"

রেখা তার নাকটা ধরে নেড়ে দিয়ে হাসি মুখে বলে উঠল, "তা বই কি, আরও যদি কিছু না জানতুম তা হলে ও যা হয় হতো।"

বিনীতা মুখ সরিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "কি জেনেছ?"

রেখা উত্তর দিলে, "নরেশ বাবুর কথা—"

বিনীতা হাসবার চেষ্টা করলে, কিন্তু হাসি ফুটল না।

সে বললে, "নরেশ বাবুর কথা কি?"

রেখা বললে, "তিনি এবার তোমায় বাঁধবার চেষ্টায় আছেন, আর তোমায় এ রকম ভাবে ছুটোছুটি করে বেড়াতে দেবেন না।"

বিনীতা হেসে উঠল, সে হাসি বড় অদ্ভুত, সে হাসি আর থামতে চায় না।

রেখা অপ্রস্তুত হয়ে বললে, "এত হাসির কারণ?"

বিনীতা বললে, "তোমার কল্পনার দৌড় দেখে সত্যি, পুরুষেরা যে আমাদের দোষ দেয় সেটা মিথ্যে নয়। ওরা বলে আমরা নাকি আকাশে মায়া জাল বুনি! কথাটা তর্কের সময় উড়িয়ে দেই বটে, আসলে কিন্তু কথাটা খুবই সত্যি। এই দেখ না কোথায় কি তার ঠিক নেই—অমনি তুমি ধরে নিয়েছ নরেশদা আমায় বাঁধবার চেষ্টায় আছেন। কিন্তু আমি আগেই তোমায় জানিয়ে দিচ্ছি রেখা—নরেশদা বিবাহিত, তাঁর স্ত্রীকে দেখলে তুমি আশ্চর্য্যই হয়ে যাবে,এত সুন্দর তিনি।"

রেখা খানিক চুপ করে রইল, তারপর শান্ত কণ্ঠে বললে, "কিন্তু তোমার সঙ্গে তাঁর মেলা মেশা এত বেশী যাতে লোকে সহজেই এই সন্দেহটাই করবে বিনীতা—করছে ও তাই।"

বিনীতা একটা নিঃশ্বাস ফেললে মাত্র।

রেখা বললে, "তাঁর পক্ষে এটা একেবারেই অন্যায়। তিনি বাইরে এ রকম ভাবে চলেন যাতে কেউই ভাবতে পারে না তিনি বিবাহিত, তাঁর স্ত্রী এখনও বর্ত্তমান! আমার কিন্তু বরাবরই তাঁকে লোক ভাল বলে মনে হয় না, এ আমি স্পষ্ট বলে দিচ্ছি। অবশ্য জানি তিনি দেশের জন্যে অনেক খেটেছেন, এখনও খাটছেন, আর সব দিকে তিনি খুবই ভালো, খুবই শক্ত কিন্তু এই একটা দিকে তিনি একেবারেই দুর্ব্বল। এ দিকটাতে যদি তিনি শক্ত হতে পারতেন আমি সত্যিই তাঁকে দেবতা বলতুম।"

ক্ষীণ হাসি হেসে বিনীতা বললে—"মানুষ দেবতা হতে পারে কি রেখা? মানুষের ভুল ত্রুটী পদে পদে, দেবতা হওয়ার যোগ্যতা তার কোথায়?"

এ কথা বাস্তবিকই সত্য, মানুষের দেবতা হওয়ার যোগ্যতা নেই, তবু যে অনেক মানুষ কাজে অকাজে নিজেদের দেবত্ব ফুটিয়ে তুলতে চায় এইটাই না তাদের মূর্খতা?

বিনীতা সে দিন কেবল সেই কথাই ভাবতে লাগল।

সুরেশ জিজ্ঞাসা করছিল—"আচ্ছা বউদি, দাদার হঠাৎ কি হয়েছে বলতে পারো? দিনরাত যেন অন্যমনস্ক, কোন কাজে উৎসাহ নেই, যেন ভয়ানক শ্রান্তি এসে গেছে, যাই বল—এ রকম তো ভালো নয়, এখনও যে অনেক পথ চলতে হবে, এইটুকু চলে হাঁপিয়ে পড়া, এ যে বড় বিসদৃশ বলে ঠেকে।"

লতিকা পান সাজতে বসেছিল। বাড়ীতে অনেক গুলি দাসী থাকা সত্বেও পানসাজা কাজ তার নিজের হাতে ছিল।

সে চায় কাজ, যেমন তেমন করে কাজের মধ্যে সে এখন নিজেকে বিলীন করে দিতে চায়। মাগো, কাজ ছাড়া হয়ে মানুষ বাঁচবে কি করে?

পাশের বাড়ীর বউটীর কাজ না করলেও চলে, তার স্বামী পুত্র আছে, তাদের নিয়ে খেলা করে সে সারাদিন কাটিয়ে দিতে পারে, কিন্তু লতিকা—সে কি করে এই দীর্ঘ দিনমানটা কাটাবে?

অন্তরের অন্তরালে অবস্থিত একটা বাসনা আছড়ে কেঁদে ফেরে, মুখ দিয়ে বলাতে চায়—পেলুম না গো, পেলুম না, কিছুই পেলুম না। সারাজীবনটা কেবল একটী একটী করে ফুল তুলে মালা গাঁথতে কেটে গেল, সে মালা গাঁথা শেষ হলো না গো, আর শেষ হবেও না। উষার প্রথম আলোর ঝলক ধরণীর মুখখানা ছুঁয়েই গেল মাত্র, শ্রাবণের মেঘ আকাশের অনন্ত সৌন্দর্য্য ফুটাতে দিলে না—সব আঁধার করেই রাখলে।

এ সব কেন ? শাশুড়ীর আদর আপ্যায়ন, শ্বশুরের প্রাণভরা যত্ন ভালোবাসা, সুরেশের স্নেহ—এ সব কেন? কেন সবাই বিশেষ করে তার পানেই চায়, কেন তার কাছে আসে? তাকে ছেড়ে দেওয়া হোক না, সে নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচে যাক।

সুরেশ পান নিতে এসে জাঁকিয়ে বসেছিল, একথা ও কথার পর এসে পড়ল ঠিক সেই কথাই—যে কথাটা লতিকা বাস্তবিকই এড়িয়ে চলতে চায়।

সে মুখ তুললে,—একটু হাসি তার মুখে ভেসে উঠল, শান্ত ভাবেই বললে, "তা পথ চলতে শ্রান্তি আসে বই কি ভাই, সব সময় সামর্থ্য তো সমান থাকে না, কাজেই মানুষকে চলার পথে থামতে ও হয়।"

অনেক দিন আগেকার পুরান একটা কথা মনে করে সুরেশ বলে উঠল, "না বউদি, থাকলে চলবে কি করে? সত্যি বল ভাই—এটা তো একটা সাময়িক ব্যাপার নয় যে দুদিনেই শ্রান্তি আসবে—সব থেমে যাবে। যার সামর্থ্য নাই সে তা জানে—জানে বলেই যে খোঁড়া সে লাঠি ছেড়ে এগুতে চায় না, যে অন্ধ সে চাঁদের আলো ফুলের হাসি দেখবার জন্য প্রাণপণে চোখ মেলতে চায় না। ওরা জানে—ওদের শক্তি নেই কাজেই নিজেরা কিছু করে না—পরের ওপরেই সব ভার ছেড়ে দেয়। দাদা যে কাজে নেমেছিল সেও তো তেমনি কাজ, দুদিনের জন্যে বাহাদুরী নিতে যাওয়া তো নয়। সামর্থ্য বুঝে যাওয়া উচিত ছিল, চলতে চলতে বসে পড়া দাদার মত লোকের উচিত হয় নি।"

লতিকা নিঃশব্দে সুপারী কাটিতে লাগিল। এক-তরফা কথা

বড় বেশীক্ষণ চলে না, ওপক্ষ সম্পূর্ণ নির্ব্বাক, কাজেই সুরেশ গোটা দুয়েক পান হাতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

"বুঝলে বউদি, বিনীতাদির ও আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। সে তো আমাদের বাড়ীতে ও আসে না, পথে দেখা হলেও সরে পড়বার চেষ্টা করে। সে দিন দেখা হল, সরে পড়বার উদ্যোগে ছিল কিন্তু সুরেশ তেমন ছেলেই নয়, সে খপ করে হাত খানাই ধরে ফেললে—"

বলতে বলতে সে হো হো করে হেসে উঠল, বিনীতার সে দিনকার ভাবটা তার মনে জেগে উঠল।

লতিকা জিজ্ঞাসা করলে, "সে এখন কি করছে ?"

সগর্ব্বে সুরেশ বললে, "হ্যাঁ—সেই কাজ করছে বটে। এখানকার নারী-সঙ্ঘের নেত্রী হয়েছে ভূতের মত খাটছে। চেহারাটাই ভারি খারাপ লাগল—যেন সদ্য জ্বর হতে উঠেছে। জিজ্ঞাসা করলুম অসুখ হয়েছে নাকি,—বললে, না, অসুখ করে নি!"

আজ বিনীতার কথা লতিকাকে তেমন আঘাত দিতে পারলে না—যেমন একদিন দিয়েছিল।

হোক সে কালো—তবু তার প্রাণ আছে, তার ও বাসনা কামনা আছে। লতিকা তো বলেছেই তার স্বামীকে—তিনি বিনীতাকে বিয়ে করুন। সে এমনই তো দূরে আছে, তখনও দূরে থাকবে, তবু ওরা দুজন সুখী হবে তো।

কিন্তু সেই প্রতিদিনকার নিত্য নূতন আঘাত সে সইতে পারবে তো ? নিজের মনকে সে জিজ্ঞাসা করে উত্তর পেলে—পারবে। আজও সে যা সহ্য করছে, সেদিনেও তাই সইবে, তবু ওরা সুখী হবে এই যে তার শ্রেষ্ঠ আনন্দ।

সে দিনে ঘরের জানালা দিয়ে দেখেছিল সেই ছোট খোকাটী বড় হয়ে উঠেছে। সে এখন হাঁটতে শিখছে উঠে দাঁড়ায়, পা বাড়াতে গেলে পড়ে যায়। মা পরম বিস্ময়ে দুটি চোখ বিস্ফারিত করে ছেলের পানে চেয়ে থাকে, স্বামী আসা মাত্র বলে—ওগো শুনছো, ছেলে তোমার জজ হবে, দেখছ না ওর কত বুদ্ধি এই বয়সেই।

স্বামীটী কেবল হাসে আর স্নেহপূর্ণ দুইটী চোখ ছেলেটীর 'পরে রাখে।

লতিকা নিঃশ্বাস দমন করতে পারে না।

অমনি ছেলে—হ্যাঁ, ঠিক ওই রকম একটী ছেলে সে চেয়েছিল; তাকে সে দুধ খাওয়াবে গা মুছাবে, তাকে নিয়েই পুতুলের মত সাজাবে।

বুকের মধ্যে গুমরে ওঠে ব্যথিত নারী-হৃদয়—হলো না গো, কিছু হলো না, সকল আশাই তার অপূর্ণ থেকে গেল, কোন সাধ মিটল না গো—কোন সাধ মিটল না।

সে আজকাল লুকিয়ে লুকিয়ে গীতা পাঠ করে। তার মধ্যে যে শক্ত কথা গুলো আছে তার সব গুলোর মানে বুঝতে পারুক বা নাই পারুক, তবু সে পড়ে।

সুরেশ তাকে আগেকার মতই লাইব্রেরী হতে বই এনে দেয়, দু তিন দিন পরে জিজ্ঞাসা করে "বউদি, বই পড়া হয়েছে?"

উত্তর না দিয়ে সে বইখানার ফিরিয়ে দেয়। ভাগ্যে সুরেশ জিজ্ঞাসা করে না কি পড়লে তাই রক্ষা, সে তাহলে কি উত্তর দিতো তার ঠিক নেই।

তার বর্ত্তমান আলাপ্রদ, অতীতের স্মৃতি তৃপ্তিকর, ভবিষ্যতে

কি আছে কে জানে। প্রাণপণ চেষ্টায় সে ভবিষ্যৎ দেখতে চায়, অন্ধকারের জাল ছিঁড়ে আশার আলো তো ভেসে আসে না।”

দুইটী হাতে আর্ত্ত বুকখানা চেপে ধরে সে আর্ত্তকণ্ঠে বলে ওঠে—“মাগো—”

সিন্দুরের সেই কৌটাটাকে সে একদিন দূর করে ফেলে দিয়েছে। না, নিজে যা সে পারলে না, মন্ত্রপড়া সিন্দুর পরে তাই হবে—কথাটা মনে করতেও যেন হাসি পায়। প্রাণের আকর্ষণ যেখানে নেই, ধরে সেখানে কাউকে রাখতে পারা যায় না জোর করে।

সে দিনে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল বিনীতার সঙ্গে।

যে বাড়ীতে তাদের নিমন্ত্রণ ছিল—বিনীতাও সেখানে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিল। আগেও লতিকা তাকে দেখেছে, আজও দেখলে—অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখে সে আশ্চর্য্য হয়ে বিনীতার পানে চেয়ে রইল।

সুরেশ যা বলেছিল তা ঠিক। বিনীতা ভারি রোগা হয়ে গেছে, তার মুখে চোখে ফুটে উঠেছে ক্লান্তির ভাব, সে যেন কতকটা গম্ভীর হয়ে পড়েছে, কারণে অকারণে আর সেই অসংযত উদ্দাম হাসি তার মধ্যে নেই।

সত্যবালাকে সে প্রণাম করে দাঁড়াতে তিনি তার চিবুকে হাত দিয়ে চুমো খেয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন; জিজ্ঞাসা করলেন, “বড্ড রোগা দেখাচ্ছে যে বিনু—”

বিনীতা একটু হাসলে—মুখ ফিরিয়ে উত্তর দিলে, “অনেক কাজ, খাটুনি বড্ড বেশী পড়েছে কিনা—”

সত্যবালা বললেন, “এ শরীরে বেশী খাটনি আর সহ্য হবে

না বিনু, আমার কথা শোন মা, দিনকতক বিশ্রাম নে, তারপর আবার কাজ করিস।"

বিনীতার চোখদুটি হঠাৎ সজল হয়ে উঠল, সে ঘাম মুছবার ছলে চোখ দুটোও বেশ করে মুছে ফেলে বললে, "তা তো হয় না এখন, ছেড়ে দিলে সবই নষ্ট হয়ে যাবে। খাটবার জন্যে অনেককেই পাচ্ছি, খাটিয়ে নেওয়ার লোক তো কেউ নেই।"

সত্যবালা জিজ্ঞাসা করলেন, "আমাদের বাড়ীর দিকে আর তো যাস নে বিনু।"

বিনীতা মৃদু হেসে উত্তর দিলে, "কি করে যাই, যে কাজ পড়েছে। বউদি ভালো আছ তো ভাই, তুমিও যে বড় রোগা হয়ে গেছ দেখছি। আমার যেন হাজার দিকে হাজার কাজ, তোমার তো ভাই কেবল সংসারটী ছাড়া আর কিছু নেই,—খাটনীও নেই বললেই হয়, তবু যে রোগা হও কেন আমি তা বুঝতেই পারি নে।"

লতিকা তার পানে চেয়ে দেখছিল তার মধ্যে কি আছে যাতে তার স্বামী মুগ্ধ হয়ে গেছে।

দেখতে পেলে আশ্চর্য্য তার শক্তি, প্রত্যেকের সঙ্গে মিশে প্রত্যেককে নিমেষে আপনার করার ক্ষমতা। দেখতে পেলে—প্রত্যেকেই তাকে চায়, তার সঙ্গে মিশতে পারলে, কথা বলতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করে।

দেখে দেখে লতিকার চক্ষু জ্বালা করতে লাগল।

নির্গন্ধ শিমুল ফুল, কেবল মাত্র রূপেই সে মধুপকে লুব্ধ করে তার পাশে টেনে আনে, মধুপ তার পাপড়িতে বেড়িয়ে যখন মধু পায় না, তখন তাকে ধিক্কার দিয়েই চলে যায়।

ফুলের ব্যথা মর্মান্তিক হয়ে উঠে তখনই, তখনই সে বিধাতার উদ্দেশে ডেকে বলে—"কেবল রূপই দিয়েছ, মধু তো দাওই নি, গন্ধও কি এতটুকু দিতে পারো নি গো ?"

বাড়ীতে ফিরে মাথা ধরার অছিলায় সে নিজের ঘরে বিছানার 'পরে শুয়ে পড়ল। এতক্ষণ যে দৃঢ়তা নিয়ে সে দাঁড়িয়ে ছিল, সে দৃঢ়তা আর সে রাখতে পারলে না, নির্জ্জন ঘরে তার অন্তরে সঞ্চিত অশ্রুর ঝরণা উৎসারিত হয়ে পড়ল।

সত্যবালা কখন একবার এসে দেখে গেলেন বউমা ঘুমিয়ে পড়েছে।

অনেক রাত্রে ঘরের মধ্যে খস খস শব্দ শুনে সে জেগে উঠল।

দেয়ালের গায়ে লাইটটা জ্বলছে, দৃপ্তভাবে, সবুজের আবরণে ঢাকা থাকলেও দীপ্তি তার কমে নি। সেই আলোতে সে দেখতে পেল নরেশ একখানা চেয়ারে বসে টেবলের 'পরে ঝুঁকে পড়ে কি লিখছে।

সম্ভব পত্র, আর এ পত্র যাবেও বিনীতার কাছে বোধ হয়। সে দিন যেন সে শুনতে পেয়েছিল নরেশ ও বিনীতার মধ্যে প্রত্যহ দেখা শোনা হলেও পত্রাদি চলে থাকে।

লিখতে লিখতে নরেশ হঠাৎ একসময় মুখ ফিরাতেই দেখতে পেলে লতিকা এক দৃষ্টে তার পানে চেয়ে রয়েছে।

হাতের কলমটাকে নামিয়ে রেখে নরেশ জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি এখনও ঘুমোও নি লতি, জেগে রয়েছ ?"

লতিকা স্বামীর প্রথম দৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কুচিত ভাবে চোখ মুদেছিল, প্রথম আহ্বানে উত্তর দিলে না। নরেশ আবার

যখন জিজ্ঞাসা করলে তখন ধীর ভাবে উত্তর দিলে, "ঘুমিয়েছিলুম ঘুম ভেঙ্গে গেছে।"

নরেশ বললে, "এই চেয়ারটা সরানোর শব্দে বোধ হয়। ভাবলুম আস্তে আস্তে আনব, কিন্তু কি করে যে শব্দ হল তাও বুঝলুম না। এখন ঘুমাবে?"

লতিকা মাথা নাড়লে।

নরেশ বললে, "তবে এদিকে এসো, এই চেয়ারখানায় আমার সামনে বসো দেখি, তোমার সঙ্গে আমার একটা দরকারী কথা আছে।"

লতিকা উঠে এল, চেয়ারে বসল না, টেবলে ভর দিয়ে দাঁড়াল।

নরেশ বললে, "বসবে না? আচ্ছা, তাই ভালো, তুমি দাঁড়িয়েই থাকো, আমি আমার কথাগুলো বলে যাই—কেমন?"

একটু থেমে সে বললে, "দেখ, সেদিন তুমি আমায় অনেক কথাই বলে গিয়েছিলে, আমি অবশ্য তার উত্তর অনেক কিছুই বলব ঠিক করেছিলুম। কিন্তু সে সব কথা এখন থাক, যদি আমি কোনদিন ফিরে আসি তোমায় সব বলব।"

রুদ্ধশ্বাসে লতিকা জিজ্ঞাসা করলে, "কোথায় যাবে?"

নরেশ বললে, "আমি দিল্লী যাচ্ছি।"

"দিল্লী—"

লতিকার যেন কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে এল, দিল্লীতে যে ভয়ানক কাণ্ড চলছে, সংবাদ পত্রের মারফতে সমস্ত ভারতবর্ষেই সে কথা প্রচার হয়েছে।

নরেশ একটু হেসে বললে, "দিল্লী তাতে কি? তুমি কি বলতে চাও লতিকা দিল্লীতে আজ যে কাণ্ড চলছে কলকাতায় তা চলতে পারবে না? নিরাপদ মানুষ কোন জায়গাতেই নয়, সব জায়গাতেই বিপদ আছে। আজ আমায় নিরাপদে রাখবার জন্যে যদি সিন্দুকে ভরে সব চেয়ে ভালো জায়গাতেও রেখে দাও, দেখবে দুদিন বাদেই আমার সাক্ষী পড়ে থাকবে শুধু হাড় কখানা--যার 'পরে স্মৃতিস্তম্ভই গড়ে তোলা চলে, আর কিছুই চলে না।

বলতে বলতে সে হো হো করে হেসে উঠল।

লতিকার চোখ দিয়ে নিঃশব্দে অশ্রুধারা নেমে এল, খুব সাবধানে মুখ ফিরিয়ে সে চোখের জল মুছে ফেললে।

"যাক্, শুনলুম আজ বিনীতার সঙ্গে দেখা হয়েছে, কাথাবার্ত্তা ও বেশ চলেছে—"

মনটা আর্দ্র হয়ে নরমই হয়ে পড়েছিল, হঠাৎ তাপ পেয়ে শক্ত হয়ে উঠল। ওঃ, আর কিছু নয়, কেবল এই কথার জন্যই!

লতিকা শক্তভাবে উত্তর দিলে, "হ্যাঁ দেখা হয়েছিল।"

নরেশ জিজ্ঞাসা করলে, "কি কথা হল?"

লতিকা বললে, "কিছুই নয়।"

"কিছুই নয়,—আমার কোন কথাই নয়?"

তার বিস্ময়ের ভঙ্গী দেখে লতিকার পা হতে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলে উঠল, মনে হল এই মুহূর্ত্তে যদি ঘর ছেড়ে চলে যাওয়া যায় তা হলে বেশ হয়; কিন্তু এই রাত্রে ঘর ছেড়ে বাইরে যাওয়াটা বড় কম কথা হবে না, এবং এই ব্যাপার নিয়ে কাল

বাড়ীতে কত গুলো কথা উঠবে কেবল সেইটা কল্পনা করেই সে নড়লও না।

নরেশ খানিক তার পানে তাকিয়ে রইল, বোধ হয় দেখবার চেষ্টা করলে তার মনের মধ্যে কোন ভাবটা জেগে উঠেছে।

আস্তে আস্তে সে বললে, "শোন লতি! অনেকদিন হতে একটা কথা তোমায় বলব ভেবেছি কিন্তু কি জানি কেন বলতে পারি নি। বিনীতার সম্বন্ধে তুমি যে ধারণা করে রেখেছ সেটা একেবারেই মিথ্যে, আমার সমস্ত কথা শুনলে তুমি তা বুঝতে পারবে।"

সকল জড়তা দূর করে লতিকা বলে উঠল, "না, আমি শুনতে চাই নে, আমার ঘুম আসছে, আমি শোব এখন।"

নরেশ বললে, "না হয় আধঘণ্টা আর জেগেই রইলে লতিকা, একদিন আধঘণ্টা জাগলে তোমার কোন ক্ষতি হবে না। যাতে তোমার স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় আমি তা করব না, সেটা জেনে রেখো।"

লতিকা উঠবার চেষ্টা করেও উঠতে পারলে না, চোখ ফিরাবার ইচ্ছা করলেও তার দৃষ্টি নরেশের মুখের পরেই রইল।

—১৭—

নরেশের জানালাটা খোলা ছিল, নীচে বাগানে এই রাত্রে বোধহয় হাসনাহেনা ফুটে উঠেছিল, তারই গন্ধ অতদূরে উপরের ঘরেও বাতাসে বয়ে আসছিল।

পথ দিয়ে একখানা মোটর চলে গেল, তার শব্দে চমকে উঠে নরেশ মুখ তুললে।

পাশের বাড়ীতে সেই বউটীর স্বামী হার্ম্মোনিয়ামের সঙ্গে সুর মিলিয়ে গান ধরেছিল—

কত শারদ যামিনী হইবে বিফল
বসন্ত যাইবে চলিয়া।
কত উদিবে তপন আশার স্বপন
প্রভাতে যাইবে ভুলিয়া।

লতিকা গানটী শুনছিল। এ যেন তারই বুকের গোপন বাণী আজ গায়কের মুখে গানের আকারে ফুটে উঠেছে।

ততক্ষণে নরেশ ড্রয়ার খুলে কি খুঁজছিল, গানের দিকে তার মন ছিল না। সুরটা এসে মনের দ্বারে হয় তো আঘাত করে ফিরে গেছে, দ্বার খোলার তার সময় ছিল না।

লতিকা তন্ময় হয়ে গানটা শুনছিল, হঠাৎ নরেশের ডাকে চমকে উঠল—

"এই দেখ লতিকা, এই পত্রখানা পড়ে দেখ।"

ঠিক তার সামনেই নরেশ পত্রখানা বিস্তৃত করে দিলে। নীচের নামটার পানে তাকিয়ে লতিকার মনটা দারুণ বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল, সে সবেগে মাথা নেড়ে বললে, "পরের পত্র আমি পড়ি নে।"

একটু হেসে নরেশ বললে, "কিন্তু সেই পরেই যদি তোমায় সে অধিকার দেয় লতি—?"

লতিকা একটু ঝাঁজের সঙ্গেই বললে—"কেউ দিতে চাইলেই নেওয়া যায় না। অনেক লোক দিতে পারলে হয়তো বেঁচে যায়, কিন্তু যে নেবে সে নিজের অযোগ্যতা যদি বুঝতে পারে, কোন সাহসে তার হাতখানা বাড়িয়ে দেবে?"

নরেশ এক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে বললে, "ঠিক কথাই বলেছ, কিন্তু এ ক্ষেত্রে এ কথাটা থাক লতিকা, অন্ততঃ একটুখানির জন্যে মনটাকে মার্জ্জিত সরল করে এখানা পড়ে দেখ।"

লতিকা নিতান্ত অবহেলার ভাবেই পত্রখানার 'পরে চোখ বুলিয়ে নিতে গেল, কিন্তু তারপর সে যখন মুখ তুললে তখন তার মুখে ভেসে উঠেছে অসীম বিস্ময়।

নরেশ জিজ্ঞাসা করলে, কি পড়লে?

লতিকা আস্তে আস্তে পত্রখানা সরিয়ে রাখলে।

নরেশ বললে, "তুমি আমায় বিনীতাকে বিয়ে করবার কথা বলবার আগেই আমি ওকে এ সম্বন্ধে লিখেছিলুম, মুখে জানাতে পারি নি। আমি তাকে স্পষ্টই জানিয়েছিলুম আমার কর্ম্মময়

জীবন ক্লান্তিতে ভরে উঠেছে, এ অবসাদ দূর করতে তুমি এসো—আমার পাশে দাঁড়াও, আমায় শক্তি দাও—সাহস দাও, আবার আমি কর্মস্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়ি। কিন্তু সে কি লিখেছে প'ড়েছ লতিকা—?”

লতিকা শুধু মাথা কাত করলে।

নরেশ বললে, “না সবটা তুমি পড়নি, শেষের দিকটা মাত্র দেখে গেছ তা আমি তোমার পড়ার ভাবেই বুঝতে পেরেছি। তুমি আমার আগেকার দিন গুলোর কথা তো জাননা লতিকা, যদি জানতে তা হলে হয় তো আমায় সেদিন ও রকম কথা বলে চলে যেতে পারতে না।”

এক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে সে বললে, “প্রথম কি রকম বিলাসিতা আমার ছিল তা তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ। আমি একেবারে অধঃপাতের পথেই নেমে চলেছিলুম লতি, হয় তো আমার মুক্তিলাভ ইহজীবনে আর সম্ভব হতো না যদি না বিনীতা এসে আমার সামনে দাঁড়াত। আশ্চর্য্য এই মেয়েটা, এ যেন একটা তুফান, যে জায়গা দিয়ে চলে যায় সে জায়গা লণ্ড ভণ্ড করে দিয়ে যায়, সে যে এসেছিল সে চিহ্ন থেকে যায় মানুষের বুকে।

হ্যাঁ তার পরে শোন, আসল কথা বলি। তুমি মায়ের কাছে শুনেছ সে কি রকম চঞ্চল ছিল, এক একবার এসে পড়ত তখন তাকে ভালো লাগত না, কিন্তু সে যখন চলে যেত তখন তার কথাই বেশী করে ভাবতুম।

আমার সেই পিছলে পড়ার পথ হতে কে ফিরিয়ে আনলে তা জানো,—সে বিনীতা। কি জানি কখন কি করে তাকে

ভালোবেসে ফেলেছিলুম, তার প্রতি সেই ভালোবাসাই আমায় সে পথ হতে ফিরালে।

আমি তাকে বিয়ের কথা বলেছিলুম, সে মাথা দুলিয়ে মুখ কেমন করে বলেছিল, "ছিঃ, তা কখনো হয়? তার চেয়ে এক কাজ করি এসো না কেন, তুমিও বিয়ে করো না, আমি ও বিয়ে করব না, দুজনেই দেশের কাজ করি এসো।"

তাকে সেদিন যেন বিশেষ করেই দেখলুম। দেখলুম সে সব ছেড়ে দিয়ে একলা পথে বার হয়ে এলো। সে আমায় ডাক দিলে, আমি থাকতে পারলুম না, পথের নেশা আমায় পাগল করে তুললে, আমিও বার হয়ে পড়লুম।

দেখলুম মেয়ে হয়ে সে কেমন চলেছে, মনে লজ্জা এল— আমিও চললুম। তার কাছে মাথা নোয়ালুম, সে আমার গুরু, সে আমার পথ প্রদর্শক।

তারপরেই তোমার সঙ্গে আমাব বিয়ে হল। তুমি বলতে পারো লতিকা—এ অবস্থায় তোমায় ভালোবাসা আমার পক্ষে সম্ভবপর কিনা?

আমি জানতুম বিনীতা ও আমায় ভালোবাসে, সেই সাহসেই আমি আবার তার কাছে প্রস্তাব করলুম, তাকে আমার জীবনের সহচারিণী হতে হবে, নইলে আমার এ জীবনটা একেবারেই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

সে—তাই আমায় লিখেছে সে নিজের চলার পথ পেয়েছে, একাই সে এখন পথ চলবে, কারও সাহায্যের প্রত্যাশা করে না। সে আমায় উপদেশ দিয়েছে—যেন আমি সংসারী হয়ে দিন কাটাই, স্ত্রীকে যেন অসুখী না করি।

নরেশ অনেকক্ষণ চুপ করে জানালা-পথে বাইরের পানে চেয়ে রইল।

অন্ধকার আকাশে অনেকগুলি নক্ষত্র ভেসে উঠে ঝিক মিক করে জলছিল। উতল বাতাস তখনও ঘরের মধ্যে ফুলের গন্ধ বয়ে আনছিল, পাশের বাড়ীর গান তখন থেমে গিয়েছিল।

চোখ ফিরিয়ে নরেশ লতিকার পানে চাইলে, ধ্যানমগ্না তপস্বিনীর মতই বসে রয়েছে সে, চোখ তার মাটির পানে।

"লতিকা—"

লতিকা চোখ তুলে চাইল।

নরেশ শান্ত কণ্ঠে বললে, "আমি কালই দিল্লী রওনা হব, জানি নে কবে ফিরব, আর ফিরব কিনা তারও ঠিক নেই। তুমি তত দিন এখান হতে যেও না, আমার মায়ের কাছে থাকবে।"

লতিকার চোখে পলক পড়ল না।

নরেশ একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, "সত্যি, আমি তোমায় সুখী করতে পারলুম না, এ কষ্টটা আমার মনে বড় বেশী রকমেই বাজছে। কিন্তু আমার বৃদ্ধ বাপ বৃদ্ধা মায়ের পানে তাকিয়ে মনকে প্রবোধ দিয়ো লতি, মনে করো আমি তাঁদের কে ছিলুম, তাঁদের কতখানি সুখী করতে পারলুম।"

লতিকা কি বলতে গেল, কথা ফুটল না, ফুটল একটা অস্পষ্ট শব্দ মাত্র।

নরেশ তার মুখের পানে চাইল—তার মুখখানা তখন বিকৃত হয়ে উঠেছে।

নরেশ বললে, "দুঃখ কি লতিকা, জগতে সবাই কিছু সকল সন্তান নিয়ে বাস করতে পারে না, একটা দুটা হয়তো মারা যায়,

যারা থাকে তাদের নিয়েই আবার ভুলে থাকতে হয়। যাদের স্বামী যায়, তারা হয় তো সেই স্বামীর স্মৃতিটা মনে জাগিয়ে সমস্ত জীবনটা কাটিয়ে দেয়। তুমিও তেমনি করে থেকো—না হয়—"

"তুমি কি আমায় এমনি করেই রেখে যেতে চাও গো, এমনি করে বুকটা আমার খণ্ড খণ্ড করে পায়ে দলে চলে যেতে চাও—"

ছিন্ন লতার মতই লতিকা নরেশের পায়ের কাছে আছড়ে পড়ল,—তার পায়ের কাছে উপুড় হয়ে পড়ে চোখের জলে মাটি ভিজিয়ে ফেললে।

আর্দ্র কণ্ঠে নরেশ ডাকলে—"লতি—"

"না, আমি সে রকম ভাবে থাকতে পারব না, আমি পারব না। আমায় অমন করে পুড়িয়ে মের না, নিজেকে এমন করে নষ্ট করো না। আমি তোমার কাছ হতে অনেক দূরে থাকব, তোমার কাছেও যাব না—তুমি যেয়ো না।"

লতিকা ক্ষুদ্র বালিকার মতই উচ্ছ্বসিত ভাবে কাঁদতে লাগল।

—১৮—

লতিকা তখনও নরেশের শুভ্র পা দু'খানির মধ্যে মুখ গুঁজে চোখের জলে শুধু একটি কথাই বার বার বলছিল—"তুমি যেও না, আমি তোমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখব না, শুধু তুমি বল তুমি যাবে না।"

বিব্রত নরেশ অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর আস্তে আস্তে ওকে মাটির থেকে টেনে তুলে—"আঃ—লতু তুমি এরকম ছেলে-মানুষী করছ কেন! রাতারাতিই ত আর আমি পালাচ্ছিনে, চল শোবে চল।"

লতিকার হাতখানা ধরে নরেশ শয্যার ওপর বসল, লতিকাকে নিজের পাশে এনে বল্লে—"চুপ করে লক্ষ্মীমেয়ের মত এবার ঘুমিয়ে পড়"।

লতিকার কান্না এতক্ষণে থেমে গিইছিল, এবার চোখটা ভাল করে আঁচলে মুছে নিয়ে, নিজের দুর্ব্বলতাটাকে প্রকাশ করে ফেলার বিরক্তি ও অপ্রতিভতাটাকে গোপন করবার জন্যে চুপ করে মাটির দিকে চেয়ে বসে রইল

নরেশ আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বল্লে—"এক দুই, তিন, শিগগির শুয়ে পড়—আমি এবার আলো নিভিয়ে শোব"।

লতিকা আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ল, নরেশ সুইচটা টিপে আলো নিভিয়ে লতিকার পাশেই শুয়ে পড়ল।

রাত্রি গভীর হয়ে আসে, সন্ধ্যা থেকেই মেঘ করেছিল এখন ঝড় ওঠে উদ্দাম—চঞ্চল বেগে। বৃষ্টি নামে ঝম ঝম ঝম। ঘুম উভয়েরই আসে না। ওরা দুজনেই মনে করে অপরে বুঝি ঘুমিয়েছে।

বিবাহের পর নরেশের আচরণে লতিকার অবমানিত নারীত্ব ঘৃণায় বিমুখ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তার পর—তার পর ও নিজের বিমুখ অন্তরকে আবার শান্ত করল—ও যে স্বামী, ও যে দেবতা।

সে দেবতা অব্যয় অব্যক্ত চিন্ময় ঈশ্বর নয়, সে স্রষ্টা শিল্পীর হাতে গড়া পাষাণ দেবতা।

ওকে সিংহাসনে বসিয়ে পূজা করতে হয় নইলে অমঙ্গল হবে। কিন্তু তোমার দুঃখে যদি পাষাণ না টলে তা হ'লেও অনুযোগ করতে নেই, দেবতাকে অপরাধী বল্লেও অপরাধ হয়।

লতিকার জাগ্রত চোখে স্বপ্ন নামে।

স্বামী যদি ওকে অন্তরের দিক থেকে বঞ্চিত করে ত' করুক। ও সুদূর অনাগত ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে দেখে, সেখানে ওর কোন অভাব অভিযোগ অপূর্ণতা নেই, পুত্র কন্যা বধূ জামাতা, এমন কি তাদের কোলেও শিশু মুখ, কল্পনার পথ দিয়ে ভেসে আসে, সেখানে ও তৃষিতা প্রিয়া নয়, সেখানে ও মহারাজ্ঞী—রাজরাজেশ্বরী মহিমময়ী জগদ্ধাত্রী রূপা।

হায়রে বাঙ্গালীর মেয়ে!

বাইরে কড় কড় করে মেঘ ডাকে, দূরে হয়ত বাজ পড়ে, লতিকার স্বপ্নের জাল ছিঁড়ে পড়ে।

আবার কাটে অনেক্ষণ।

লতিকা এবার আস্তে আস্তে সরে এল নরেশের দিকে, নরেশও পাশ ফিরে শুয়েছিল, লতিকা নিজের ডান হাতখানা উঁচু করে তার ওপর নিজের মাথা রেখে বাঁ হাত দিয়ে নরেশের মাথাটা কাছে টেনে এনে, মাথায় বুকে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

লতু মনে করেছিল নরেশ ঘুমিয়ে, কিন্তু ও জেগেই ছিল, নরেশ লতিকার দিকে পাশ ফিরল, ওর বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে লতিকাকে আরো কাছে টেনে এনে দুইহাতে মুখখানা চেপে ধরল, মুখখানা ওর নত হয়ে এল লতিকার মুখের ওপর—সেই এক মুহূর্তে লতিকার মনে হল ও হিন্দুর মেয়ে, সাবিত্রী যমের হাত থেকে স্বামীকে ফিরিয়ে এনেছিলেন ও তেমনি করেই বিনীতার হাত থেকে ওর স্বামীকে ফিরিয়ে আনতে পারবে।

ত্রেতাযুগে রাবণের রাণী ছিল মন্দোদরী। বালীর তারা, রামের সীতা, কিন্তু কলিযুগের সাম্য তন্ত্রে ওরা সবাই এক। রাবণের রাণী মন্দোদরী নয়, এ যুগে রাবণের জন্যও সীতারি সৃষ্টি হয়।

নরেশ কিন্তু পরক্ষণেই পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল, বিরক্ত সুরে বল্লে—"এখনো ঘুমোওনি ? আঃ—সমস্ত রাত জেগে রয়েছ কেন, অসুখ করবে যে!"

মেঘ ও রৌদ্র, প্রথম ব্যাপারের সঙ্গে শেষ কথাগুলির কোন সামঞ্জস্য নেই।

লতিকা একটু চুপ করে থেকে পরে বল্লে—"অসুখটা আমারি একচেটে নাকি ? তুমি কেন জেগে আছ ?"

"আমি জেগে আছি বলে তুমিও জেগে থাকবে এমনতো কোন কথা নেই।"

লতিকাও হাসলে, বল্লে—"কেন নেই? নিশ্চয় আছে।"—"নিশ্চয় আছে মানে, আমি সে অধিকার কি কখন তোমাকে দিইছি?"

—"না হিন্দুর মেয়েকে ও অধিকার দিতে হয় না। তার স্বাভাবিক স্বধর্ম্মে সে আপনি নেয়।"

একটু দুঃখিত সুরে নরেশ বল্লে—"হিন্দুত্বের কথা ত' নয় লতু।"

—"কেন নয়? আমাদের বিয়েটাত আর কোরাণ সরিফ দিয়ে হয়নি। সে আমাদের দাড়ি গোঁফ কামান, নেড়া মাথায় দেড় হাত টিকি কেনো ভটচায ভুল উচ্চারণে হিন্দুর দেবভাষা উচ্চারিত করে দিয়েছিল।

আর হিন্দু বিয়ের মন্ত্রের ভয়েই ত তুমি দেশত্যাগী হচ্ছ, বিলিতি বিয়ে হ'লে কি আর দেশ ছাড়তে, ঘরে বসেই বিবাহ-বিচ্ছেদ করাতে পারতে"।

নরেশ ক্ষীণ হাসি হাসলে—"না লতু আজ আর নিজেকে মিথ্যার আবরণে চাপা দেব না, তুমি ভুল করছ, আমি তোমার ভয়ে দিল্লী যাচ্ছিনে।"

এবার লতিকা চুপ করে গিইছিল, হঠাৎ নিজের অজ্ঞাত সারেই প্রশ্ন করে ফেল্লে—"তবে?"

লতিকার আজ দুঃখের সঙ্গেও অন্তরে গর্ব্ব জেগেছিল স্বামীকে ও দুর্ব্বল করতে পেরেছে, তাই আজ নরেশ ওরই মন্ত্র-ভয়ে দেশ ছাড়ছে। কিন্তু যখন নরেশের মুখেই শুনল যে তার জন্যে ও যাচ্ছে না, তখন লজ্জায় দুঃখে ক্ষোভে অপমানে, ওর সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হয়ে উঠল, ও ভুলে গেল মন্ত্রশক্তি অসীম ক্ষমতার কথা!

নরেশ বলতে লাগল—"আমি এতদিন আশায় ছিলুম, বিনীতার কর্ম্ম-জীবনে যেদিন ক্লান্তি আসবে, সেদিন ও আমারি কাছে এসে দাঁড়াবে, সেইদিনটির আশায় আমি একটি একটি করে দিন কাটাচ্ছিলাম। কিন্তু আজ সে পরিষ্কার না বলে দিয়েছে। আজ ঘরের কোণে চুপ করে এলোমেলো ভেবে কোন লাভ নেই, তাকে আমার ভুলতে হবে।"

লতিকা কোন সাড়া দিলে না, অনেক্ষণ পর্য্যন্ত ওর সাড়া না পেয়ে নরেশ প্রশ্ন করল—"কি ভাবছ লতু?"

লতু শুষ্ককণ্ঠে হেসে উঠল—"ভাবছি কি জান, দেশমায়ের আবরণে বিনীতাকে চাপা দিয়ে আমাকে এমন অদ্ভুত করবার তোমার কি প্রয়োজন ছিল।

মা বৌ চেয়েছিলেন, বিনীতাকে এনে দিলেই পাবতে, তুমি সুখী হতে। তোমার স্ত্রীকে মা বাবা ফেলে দিতে পারতেন না। আর যদিই দিতেন, তুমি ত অক্ষম ছিলে না।"

—"কিন্তু সে বিয়ে করতে অস্বীকার করেছিল লতু!"

লতিকা বিস্মিত আঁখি তুলে নরেশের দিকে চাইল।

একি ওর বিশ্বাস না শুধু আবৃত্তি!

একটু থেমে লতিকা বল্লে—"একি তোমাদের school girl sentiment নয়? এতখানি যখন এগিয়েছিলে তখন এগিয়ে যাওয়া উচিত ছিল, একান্ত মনে অন্তরে যাকে চাও বাইরে তাকে শুধু দুটো আদর্শের স্তোক দিয়ে ভুলে থাকবে, প্রেমের পথ কি এতই সোজা! তোমরা দূরে যাওনি; শুধু মাঝখানে আমার আড়াল তুলে একটা অদ্ভুত অবস্থা ঘটিয়ে তুলেছ। যে দুঃখকে হাসিমুখে সহ্য না করা যায়, যে বেদনা

গৌরব দেয় না, সে শুধু বোঝা। অন্তরকে জীর্ণ করে; বাহিরকে রুক্ষ করে। দূরে যাওয়ার দুঃখকে তোমরা সহজ করে নিতে পারনি; কোন দিন না। ধ্যান করে কাটাতে পারে তারা যারা পরম ভাবে পেয়েছে, কিম্বা একেবারে পায়নি। তোমাদের মধ্যে যা ছিল সে কি ধ্যান? সেত অনুষ্ঠান; আমাকে তোমাদের সেই অনুষ্ঠানের ক্রটি হীন সাক্ষী করে রেখেছ! কিন্তু না থাক।"—বলে লতিকা মুহূর্ত্ত চুপ করে বল্লে—"বিনীতাকে তুমি বিয়ে কর আমি দুঃখ পাব না।"

"বিনীতা বলেছে তোমাকে সুখী করতে, তোমাকে দুঃখ দিয়ে সে বিয়ে করবে না।"

নরেশর কথায় এত দুঃখেও লতিকার হাসি এল, প্রেম ও ভিক্ষা করে নেবে বিনীতার কাছ থেকে! মুখে বল্লে—"বিনীতা এ ধরণের কথা বলবে সে আর আশ্চর্য্য কি। কিন্তু আমার জন্যে যদি বিনীতা বিয়ে না করে, তা'হ'লে আমাদের তিনজনের মধ্যে কেউ কি সুখী হ'বে?"

ঢং ঢং করে বড় ঘড়িটায় তিনটে বাজল, নরেশ বল্লে—"এবার ঘুমিয়ে পড়।"

ও পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল।

লতিকা অন্ধকারে দেয়ালের দিকে চেয়ে রইল, নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসে, ও আকুল হয়ে যুক্ত করে ভিক্ষা চায়,—"এবার আমায় মুক্তি দাও ঠাকুর, সহজ হ'তে দাও।"

... ...

স্নান সেরে সত্যবালা ছেলেদের খাবার গুছিয়ে রাখছিলেন, লতিকা পাশে এসে বসল—"মা।"

সত্যবালা মুখ তুলে বধূর দিকে চাইলেন—"কি মা, কিছু বলবে ?"

একটু চুপ করে থেকে লতিকা বল্লে—"উনি আবার দিল্লী যাবেন শুনলাম।"

"কে বল্লে নরেশ ? তা তুমি শুনে কিছু বল্লে না ?"

—"আমি আর কি বোলবো মা !"

বধূর মুখে এমন হতাশার স্বর বেজে উঠল, যে স্বর উনি আর কখন শোনেন নি।

উনি লতিকার দিকে চেয়ে রইলেন, আজ ওর মুখের দিকে চেয়ে ওঁর মাতৃহৃদয় দুঃখে বেদনায় হাহাকার করে উঠল।

আজ বধূর স্বামী-প্রেম লাভের অক্ষমতার কথা মনেও পড়ল না, আজ অন্তরের জননী গর্জ্জে উঠল সন্তানকে দুঃখের আবর্ত্ত থেকে রক্ষা করতে না পারার বেদনায়। চোখের কোণে জল হয়ত উচ্ছল হয়ে উঠেছিল, উনি কাজ ফেলে দিয়ে উঠে পড়লেন।

লতিকার চিবুক স্পর্শ করে হাতখানা ঠোঁটে ঠেকিয়ে তার পর মাথায় হাত রেখে বল্লেন—"আশীর্ব্বাদ করি মা নরেশ যেন তোমায় চিনতে পারে।"

উনি আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলেন।

নরেশ কে আটকান গেল না। মায়ের চোখের জল, পিতার নিষেধ সমস্ত ব্যর্থ করে সে চলে গেল দিল্লী।

যাবার সময় সত্যবালা নরেশের হাত ধরে মিনতি করে বলেছিলেন—"দেরী করিস নে—বাবা যত শিগগির পারিস ফিরতে চেষ্টা করিস।"

নরেশ কোন কথা বলেনি, শুধু ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিল যে সে দেরী করবে না।

নরেশ গিয়ে মোটরে উঠল, লতিকা সত্যবালার পাশ থেকে আস্তে আস্তে ফিরে গেল নিজের ঘরে।

এতক্ষণের সংযমের বাঁধ ভেঙে পড়ল, লতিকা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে আকুল হয়ে কেঁদে উঠল। অশ্রু ওর বিরহের নয়, ওর পরাজয়ের।

অনেকক্ষণ কেটে গিইছিল, কতক্ষণ তা কে জানে, মাথার ওপর হাতের স্পর্শ পেয়ে লতিকা তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে মুখ খানা মুছে ফেলে চেয়ে দেখল চেয়ারের পাশে সত্যবালা দাঁড়িয়ে, লতিকা তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াইতেই সত্যবালা ওকে দুইহাতে জড়িয়ে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন, আবার অনেকক্ষণ কেটে গেল, এতক্ষণ পরে সত্যবালা বল্লেন—"এখুনি রমলা এসে পড়বে, চল থপ করে চুলটা বেঁধে দিই।"

—"থাকগে মা, আজ রমলাদিকে বারণ করে পাঠাই, বলে দি যে আজ আমার অন্য কাজ আছে।"

"না মা, রমলা এলে তবু পড়া শুনা এদিক ওদিকে মনটা ভাল থাকবে!"

এবার লতিকা আর কোন কথা না বলে সত্যবালার সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

খানকতক বই হাতে করে রমলা এল। লতিকা রমলাকে নিয়ে নিজের ঘরে এসে বসল। একটুখানি নতুন রকম সেলাই দেখিয়ে দিয়ে, রমলা লতিকাকে পড়াতে বসলে। পড়াতে পড়াতে রমলা লতিকার দিকে চাইল—"আজ আর তোমার পড়ায় বোধহয় মন লাগছেনা, না লতু?" বলে একটু অর্থ পূর্ণ হাসি হেসে উঠল।

লতিকার ঠোঁটের কোণে একটু ক্ষীণহাসি ফুঠে উঠেই মিলিয়ে গেল, অতখানি সৌভাগ্য থাকলে ত ও বেঁচে যেত, বিরহের বেদনা বহন করা সে ও ত মানুষের সৌভাগ্য।

লতিকাকে যে মালা-বদলের মালার রজ্জুতে কণ্ঠ বেঁধে, শাল-গ্রামের পাষাণ ভার বুকে চাপিয়ে, ধর্ম্মের মহাসাগরে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে!

রমলা আজ পড়ার বই খানা বন্ধ করে রাখল—"আজ পড়া থাক, আর হ্যাঁ দেখ এই বইখানা তোমার জন্যে নিয়ে এলাম, তুমি সময় মত পড়ে দেখ, তোমার ভাল লাগবে বোধহয়। বেশ বই—আজকের দিনে প্রত্যেক নারীর ভাববার বিষয়।"

লতিকা বই খানা হাতে নিয়ে খান কতক পাতা উল্টে দেখল তার পর টেবিলের ওপর বই খানা রেখে একটু হেসে বল্লে—

"আপনাকে একটা কথা বলব, আশা করি কিছু মনে করবেন না, আপনার হাতে কিন্তু এ বই মানাচ্ছেনা, স্ত্রী-স্বাধীনতার বক্তৃতা দেওয়া, স্ত্রী-স্বাধীনতা বিষয় লেখা, কিম্বা খুব ভাল বলে পড়ে হাততালি তারাই দেবে, যারা ন্যায্য বলে ঘরের পুরুষদের অত্যাচার নির্ব্বিকার চিত্তে হজম করে, তারাই বাইরের লোকদের চমকে দেবার কিম্বা ভয় দেখাবার জন্যে স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা বলে। আপনার মনে এ ধরণের প্রশ্ন ওঠা উচিত নয়, কারণ ওর মীমাংসা আপনার ত হয়ে গেছে।"

—"লতু এ কথাগুলো ঠিক ছাত্রীর মত নয়!" .বলে রমলা হেসে আবার বললে—"ও কথা বলা তোমার অন্যায়, আমি সুখে আছি বলেই চোখ বন্ধ করে বসে থাকব, চারিপাশে চেয়ে দেখবে না?"

—"আমি ঠিক ওধরণের কথা বলিনি, চেয়ে দেখবো চোখ দিয়ে, অনুভব কবব অন্তর দিয়ে, কাগজে কিম্বা মুখে তুবড়ী ছোটান নয়, প্রত্যেকের স্বাধীনতার কথা ভাবতে হ'বে, স্ত্রী বলে নয় পুরুষ বলেও নয়—মানুষ বলে।"

বলে লতিকা একটু হেসে এস্রাজটা টেনে নিয়ে বল্লে—"যাক গে ওসব কথা, একটু বাজনা বাজ'ন যাক, তর্ক করতে গেলে প্রত্যেক কথার সঙ্গে এমন যুক্তি দেওয়া উচিত যে অপর পক্ষ অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যে চুপ করে উত্তর ভাবে, তা না হ'লে তর্ক মানে শুধু হট্টগোল। অত যুক্তি আমার মধ্যে নেই, অতএব তর্ক না করাই ভাল। তর্ক ঠিক মদের মত, ওষুধের সঙ্গে অল্প হয়ত উপকার দেয়, কিন্তু বে-হিসিবী—অকারণে খেলে পুলিশের ঝোলায় চড়বার সম্ভাবনা আছে।"

লতিকা এবার চুপ করে বাজনটা বাজাতে লগল।

ঝি ডাকল—"বৌ ঠাকরুণ, মা ডাকছেন।"

লতিকা সত্যবালার উদ্দেশ্যে চলে গেল। খানিক পরে ফিরে আসতে আসতে শুনতে পেল, রমলা তার সুন্দর মিষ্ট গলার সুর এস্রাজের সঙ্গে মিলিয়ে গাইছে।

—'শুধু এইটুকু মোর রইল অভিমান
ভুলতে কি গো পার ভুলিয়ে মোর প্রাণ।"

লতিকা এসে রমলার পাশে বসে পড়ল। গান শেষে খানিকটা গল্প করে রমলা উঠে পড়ল—"লতু আমি কাল আবার আসব'খন, আজ ত তোমার মন লাগছে না।"

লতিকা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

এখন অনেকখানি অবসর, হাতে কোন কাজ নেই লতিকা রমলার গাওয়া গানটী বাজনার সঙ্গে সুর মিলিয়ে গাইতে লাগল।

... ...

শৈলেশ্বর বাবু এতক্ষণ নিজের ঘরে চেয়ারে আড় হয়ে শুয়েছিলেন, চিন্তার পর চিন্তার স্রোতে ওঁর মন আকুল হয়ে উঠছিল, নরেশ ওঁকে দিনের পর দিন চিন্তার অকূল পাথারে ডুবিয়ে দিচ্ছে, অন্য সকল সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে যে বেদনা আকুল হয়ে ছুটে আসে, তার কূল আছে, কিন্তু সন্তানের মধ্যে দিয়ে যে দুঃখ আসে সে বুঝি অকূল পাথার! ভাবতে ভাবতে শৈলেশ্বর বাবুর নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসে, রূপে গুণে এমন কি বিদ্যার ক্রটী ও লতিকায় নেই, নরেশ কি চেয়েছিল তাও ত একবার পিতার কাছে বলেনি।

শৈলেশ্বর বাবু অস্থির ভাবে উঠে পড়ে অন্দরের দিকে আসেন।

সত্যবালা নিজের ঘরে শুয়েছিলেন শৈলেশ্বর বাবু এসে দাঁড়ালেন, স্ত্রীর কপালে হাত রেখে বল্লেন—"শুয়ে রয়েছ যে? ভাবনার কি আছে? দেশ দেখতে গেছে, দিন কতক বাদে আবার ফিরে আসবে, নরেশ ত আর সেই ছোট্ট নরেশ নেই যে ঘুরে ফিরে তোমার কোলে এসে লুকুবে। আচ্ছা পাগল তুমি।"—আরো ঐ ধরণের এলোমেলো কথা বকে যেতে লাগলেন, সত্যবালাকে সান্ত্বনা দিলেন কি নিজেকে প্রবোধ দিলেন তা কে জানে!

এতক্ষণকার রুদ্ধ অশ্রু স্বামীর স্নেহ স্পর্শে উছলে উঠল, উনি স্ত্রীর মাথার পাশে বসে নিঃশব্দে সত্যবালার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। সন্ধ্যা নেমে আসে—ধরণীর শ্রান্ত দেহে আকাশের স্নেহস্পর্শ নিয়ে।

দিকে দিকে শঙ্খ ধ্বনিতে সন্ধ্যার বরণ করে। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধতার পর শৈলেশ্বরবাবু জিজ্ঞেস করলেন—"বৌমা কোথায়?"

—"বোধহয় নিজের ঘরে।"

আবার নিস্তব্ধতা!

কোন সান্ত্বনার কথাই আজ মনে আসেনা, যা বলে উনি স্ত্রীকে শান্ত করবেন।

একটা কাঁটা উভয়ের বুকের মধ্যে কেবলি খচ খচ করছে, কিন্তু কোথায় যে ফুটেছে তার স্থান নির্দ্দেশ কিছুতেই হ'চ্ছে না!

অনেকক্ষণ পরে শৈলেশ্বরবাবু সত্যবালার পিঠে হাত রেখে বল্লেন—"চল বৌমার কাছে যাই।"

শৈলেশ্বরবাবু সত্যবালা দু'জনেই উঠে লতিকার ঘরে গেলেন।

লতিকা চুপ করে অন্ধকার ঘরে জানলার সামনে চেয়ারটা নিয়ে বসেছিল।

ওর কল্প-লোকের সুন্দর, যার প্রতিচ্ছবি ও দেখতে চেয়েছিল নরেশের মধ্যে—সেকি এই!

অন্তর ওর হাহাকার করে কেঁদে ওঠে।

লতিকা আস্তে আস্তে উঠে সুইচটা টিপে গীতা খানা হাতে নিয়ে বসে পড়ল, কর্ম্মেই অধিকার কর্ম্ম-ফলে নয়, গীতার আদেশ, লতিকার হাসি পেল, ও-ত কর্ম্ম কিছুই করে নি, কিন্তু কর্ম্মফলের বোঝা ওরই ঘাড়ে পড়ল!

এ বোঝা কি ও জীবনে কখন নামাতে পারবে! 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়' ওর চোখে জল এল, ও-ত স্বধর্ম্মকেই প্রাণপণে জড়িয়ে ধরেছিল, ওকে-ত জোর করে ধর্ম্মচ্যুত করিয়েছে, ও যে সহজ বন্ধনের সুরে সুরে মুক্তির অসীম অনন্ত পথে চলে যেতে চেয়েছিল, সেই ছিল ওর স্বধর্ম্ম।

উদাসিনী সন্ন্যাসিনী হয়ে কর্ম্ম হীন ভাবে সর্ব্বদা গীতা হাতে করে বসে থাকা ওর ধর্ম্ম নয়।

লতিকা আস্তে আস্তে গীতা খানা রেখে দিয়ে আলোটা নিভিয়ে আবার জানলার সামনে বসে পড়ল। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে শৈলেশ্বর বাবু ডাকলেন—

—"মা।"

লতিকা মনে মনে লজ্জিত হয়ে উঠল, এতক্ষণ ও এমন অন্যমনস্ক হয়ে ছিল যে ওঁর পদ শব্দ পর্য্যন্ত ওর কানে যায় নি।

তাড়াতাড়ি আলো জ্বেলে এগিয়ে এল।

—"আসুন বাবা।"

ওঁরা উভয়ে ঘরে ঢুকলেন।

শৈলেশ্বর বাবু একটা চেয়ারে বসে পড়ে বল্লেন—

—"মা ত আর আজকাল ছেলে বলে মনে করেন না, মা আমার সৎমা কিনা। কাজেই ছেলেকেই মনে করতে হয়।"

লতিকা এসে শ্বশুরের পায়ের কাছে চেয়ারের নীচে বসে পড়ল, উনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, "মাটীতে কেন মা, ঐ চেয়ার খানাতে বোস।"

—"আপনি ব্যস্ত হবেন না বাবা, আমি বেশ বসেছি।"

বলে লতিকা ওঁর পায়ের ওপর হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

শৈলেশ্বর বাবু ওর মাথাটা কোলের ওপর টেনে নিয়ে, হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ছোট ছেলেব মত এলো মেলো বকতে লাগলেন।

ওঁর সব চেয়ে বড় ক্ষোভ আজ লতিকাকে নিয়ে, ওকে উনি মস্ত বড় আশা দিয়ে এনে বিশাল নৈরাশ্য পাথারে ডুবিয়ে দিয়েছেন।

অনেক দুঃখ, শৈশবের অনেক বঞ্চিত হওয়ার ব্যথা সন্তান কাল ক্রমে ভুলে যায়, কিন্তু যাঁরা বঞ্চিত করেন পিতা মাতার অন্তরে সেগুলি চিরদিনের মত কাঁটা হয়ে বিঁধে থাকে।

... ...

আবার দিনের পর দিন আসে যায়।

নরেশের চিঠি আসে, পড়া শেষে শৈলেশ্বর বাবু চিঠি খানা সত্যবালার হাতে দিলেন।

—"নরেশের চিঠি, তোমাকে ও লিখেছে।"

সত্যবালা স্বামীর হাত থেকে চিঠি খানা নিলেন।

পিতার চিঠির সঙ্গে ছোট্ট একটু খানি ওঁকে ও লিখেছে, 'তুমি আমার জন্য কিছু ভেবনা, আমার কোন অসুবিধা নেই।' সত্যবালার চোখে জল উজ্জ্বল হয়ে উঠল। নরেশের জন্য ভাববার ওঁর দরকার নেই সেইটেই ও দু'তিন বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছে, নরেশের দুঃখের সান্ত্বনা আজ আর মায়ের কাছে নেই তাই ও মায়ের কোল ছেড়ে চলে গেল দূরে—বহুদূরে—শান্তির আশায়।

আজ উনি মস্ত বড় দুঃখের মধ্যে দিয়ে প্রথম বুঝতে পারলেন, ওঁর ক্রোড়ের নরেশ ওঁর সমস্ত ক্রোড় ছাপিয়ে উঠে গেছে!

নরেশ আজ মাকে মুক্তি দিয়েছে! অকৃতজ্ঞ সন্তান!

সত্যবালার চোখের জলে এই ধরণের কথাই মনের অঙিনায় উঁকি দিতে লাগল।

মুক্তিত সন্তানের দেবার কথা নয়, সেত মা আপনিই চেয়ে নেন।

স্ত্রী যেমন সন্তানকে নিয়ে পত্নীত্বের গণ্ডী ছাড়িয়ে যায়, মা তেমনি সত্যকে নিয়ে মাতৃত্বের সীমা উল্লঙ্ঘন করে যাবে, এইত পথ। কিন্তু এযে পথ ছাড়িয়ে যাবার আগে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেওয়া!

অনেকক্ষণ পরে চোখটা আঁচলে মুছে ফেলে সত্যবালা স্বামীর দিকে চাইলেন—"আর কোন চিঠি নেই"?

উনি একখানা লতিকার চিঠিরও আশা করছিলেন।—

শৈলেশ্বরবাবুরও কথাটা মনে হয়েছিল, উনি আস্তে আস্তে ঘাড় নেড়ে ভাঁড়ার ঘরের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন—"কিছু খাবার আছে ?"

লতিকা ভাঁড়ার ঘর থেকে জিনিষ বার করছিল, ফিরে দাঁড়াল—"আছে বাবা, আপনাকে দেব ?"

"দাও, কিন্তু তোমার তৈরী দিও।"

লতিকা অপ্রস্তুত হয়ে গেল—"আমিত আজ করিনি বাবা, আপনিত রোজ খান না তাই করিনি। অন্য খাবার দেব ?"

—"ঠাকুরের করা মুখে তোলা যায় না। আর বাজারের খাবার সেত রোগের ডিপো। তুমি কালকে যা তৈরী করেছিলে সে নেই ?"

—"আছে বাবা দেব ? কিন্তু বাসি।"

—"তা' হোক, তাই দাও। মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে না ভাই।"

শৈলেশ্বর বাবু হাসতে লাগলেন।

লতিকাও একটু হেসে বারাণ্ডায় আসন পেতে শ্বশুরের জন্য খাবার নিয়ে এল।

সত্যবালা এসে এক পাশে বসলেন!

লতিকা আবার ফিরে যাচ্ছিল,শৈলেশ্বরবাবু ডাকলেন "—মা।"

লতিকা ফিরে দাঁড়াল—"কি বাবা ?"

শৈলেশ্বরবাবু হেসে উঠলেন—"কি মা! সব কথাই ছেলেকে শিখিয়ে দিতে হবে! খেতে দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছ!"

লতিকা হাসিমুখে বললে—"না বাবা পালাচ্ছি নে, এক গ্লাস জল নিয়ে আসি।"

লতিকা জলের গ্লাসটা শ্বশুরের পাশে রেখে সত্যবালার পাশে বসে পড়ে, সত্যবালার মুখের দিকে চেয়ে হেসে বল্‌লে—"বাবা এমন সুন্দর ডাকেন।—"

কথাটা শেষ হতে না দিয়েই সত্যবালা হেসে বল্‌লেন—"মার আমার অমন সুন্দর প্রতিমার মত চোখ থাক্‌লে কি হয়! তুমি বড় এক চোখ! যাও, আমি আর মা বলে ডাকবো না—সৎ মা বলে ডাকব।"

লতিকা হাসল।

শৈলেশ্বরবাবু নানা রকম গল্প আরম্ভ করলেন, কোন রকমে উনি চান ওর অবস্থাটাকে ভুলিয়ে রাখতে। হায়রে স্নেহ কাতর মন!

যে নির্ঝরিণী পর্ব্বতের ক্রোড় ছাপিয়ে বেরিয়ে গেছে, তার গতি পথে যদি মরুভূমি পড়ে সে মরুভূমির বুকে শুষ্ক হয়ে যায়, কিন্তু পর্ব্বতের কোলে সে ত ফিরে যেতে পারে না!

... ...

দুপুর বেলায় লতিকা সত্যবালার পাশে শুয়ে এলো মেলো ভাবে চুলের মধ্যে আঙ্গুল চালাচ্ছিল। সত্যবালা অনেকক্ষণ বধূর মুখের দিকে চুপ করে চেয়ে থেকে পরে বল্লেন—"নরেশের চিঠি খানা ঐ দেরাজের ওপর আছে পড়ে দেখ।"

আবার একটু ইতঃস্তত করে বল্লেন—"আর হ্যাঁ ভাল কথা তুমি একখানা চিঠি দিও।"

লতিকা চুপ করে রইল।

সত্যবালা লতিকাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বল্লেন—"লক্ষ্মী মা আমার, দিও একখানা চিঠি।" চোখের কোণে জল

উছলে এল, উনি আস্তে আস্তে বধূকে নিবিড় ভাবে কোলের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বল্লেন—"তোমার মূল্য নরেশ বুঝল না একি আমার কম দুঃখ, কিন্তু কি করবে বল অভিমান করে ত কিছু লাভ নেই!"

বধূ আস্তে আস্তে ঘাড় নেড়ে অস্ফুট ভাবে বল্লে—"লিখবো না।"

... ...

দিনের পর দিন যায় মাস যায় ক্রমে বৎসর ঘুরে আসে। নরেশের কিন্তু ফিরে আসবার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না।

নরেশের চিঠি ও ক্রমে সংক্ষিপ্ত হয়ে আসে। সত্যবালা এবার শয্যা নিলেন, ওঁর বহু কালের হার্টের অসুখ এবার প্রবল হয়ে উঠে ওঁকে শয্যা-শায়ী করে দেয়।

নরেশকে সকলেই ফিরে আসবার জন্যে লেখে, কিন্তু নরেশ ফিরে আসে না।

নরেশকে চিঠির উত্তর দেবার পর হ'তেই বিনীতা যেন ক্ষয় রোগীর মত শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল।

ও এমনি করেই দেশের কাজ নিয়ে সচ্ছন্দে দিন কাটাতে পারত, যদি লতিকা ওদের মাঝে অত্যুচ্চ হিমালয় রূপে এসে না দাঁড়াত। সেদিন ও জানত নরেশের ও গৃহের গৃহিণী না হ'লেও, অন্তরের ও কল্যাণী।

সে খানে কারু অধিকার নেই।

কিন্তু আজ প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হয় নরেশকে মনে রাখাও অন্যায়।

লতিকার মুখ মনে হ'লে ও সত্যি ব্যথা অনুভব করে। আহা বেচারী! রূপ বুদ্ধি বিদ্যা সবই আছে, ফাঁক ত কোথাও নেই, তবে ওর ভাগ্যে এত বড় ফাঁকি বিধাতা কেন সৃজন করলেন! বিনীতার মনে কোন ঈর্ষা জাগে না, ও নরেশকে যেটুকু পেয়েছে তাতে কোন ফাঁকি নেই। সম্পূর্ণ করেই পেয়েছিল, তাই আজ আর ওর ঈর্ষা জাগে না, জাগে আন্তরিক সহানুভূতি।

আবার নরেশের চিঠি এল, এবার নরেশ লিখেছে—সে একটি বার বিনীতার সঙ্গে দেখা করতে চায়, শুধু একটি বার দেখা করবে, তারপর সব ছেড়ে চলে যাবে দূরে—বহু দূরে।

এবার ও ফিরবে সেই দিন যে দিন ও বিনীতাকে যথার্থ—ভুলতে পারবে।

লতিকার কথায় লিখেছে—'আমি কোন বিষয় লতুকে অযোগ্য মনে করিনে, কিন্তু অন্তর শুধু যোগ্য অযোগ্য দেখেনা।'

আমি অনেক বার শুধু সহজ জীবনের আশায় ওর সঙ্গে অভিনয় করবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু তুমি কল্পনায়ও ভাবতে পার না, সে কি অসহ্য যন্ত্রণা।'

বিনীতা চিঠিখানাকে উল্টে পাল্টে ভাল করে পড়ল, দুই চোখে জল ছাপিয়ে উঠল, ও চিঠি খানা নিজের জামার ভেতর গুঁজে রেখে শুয়ে পড়ল।

উঃ ভগবান! আর যে সহ্য হয় না ও ত মানুষ! অনেকক্ষণ চোখের জল ফেলার পর মনটা একটু শান্ত হয়ে এল, সে আস্তে আস্তে মুখটা ধুয়ে মাথার চুলটা ঠিক করে বেরিয়ে গেল। ও আর ভাবতে পারে না, তবু ভাবনাকে ছাড়িয়ে যাবার উপায় নেই, তাই ও এড়িয়ে যেতে চায়। রেখার ঘরে ঢুকল, সেখানে রেখা শুক্লা দীপ্তি অম্বা কৃষ্ণা সবাই গল্প করছিল, বিনীতাও ওদের মধ্যে এসে বসে পড়ল।

অম্বা দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করে বললে—"এই যে, আসুন, আসুন।"

বিনীতা শুষ্ক হাসি হেসে বল্লে—"অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ!"

ও আর কোন ভাবনা ভাবতে চায় না, এবার ও চিন্তা হীন, আনন্দের গান গেয়ে দিন কাটিয়ে দিতে চায়, চিন্তা কি তবু যায়, ওদের এলোমেলো গল্পের মধ্যেও তার স্রোত চলে।

বিনীতা আবার উঠে পড়ল, নিজের ঘরে গিয়ে নরেশের চিঠির উত্তর লিখতে বসল, নরেশকে বিশেষ করে জানাল যে সে দেখা করতে চায় না, ও এবার মুক্তি চায় জীবনের অনাবশ্যক

স্কুল থেকে। চিঠি খানা লেখা শেষে ভাঁজ করে খামের মধ্যে পুরে, রুমাল খানার মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে, রেখার ঘরে এল— "চলনা একটু বেড়িয়ে আসি।"

ওরা সবাই মিলে বেরিয়ে পড়ল,ডাক বাক্সের কাছে আসতেই বিনীতা চট করে চিঠি খানা বার করে ফেলে দিলে, সবাই একটু এগিয়ে ছিল, শুধু রেখা ওর পাশা পাশি ছিল. রেখা ওর মুখের দিকে চেয়ে একটু টিপে হাসল, নিম্ন সুরে প্রশ্ন করল—"কার?"

বিনীতা প্রথম একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু সেটা সামলে নিয়ে বল্লে—"কি, কার?"

—"ঐ চিঠি খানা?"

—"আমার হাত থেকে ডাক বাক্সে পড়ল তখন আমারি এটা তোমার বোঝা উচিত।"

—"আহা তোমার তাত জানি, ওটা দান করলে কাকে!"

—"কোন একটি মানুষ কে।"

—"মানুষ-টি কে?"

—"সে যেই হোক,চিঠি লিখলেই প্রেমপত্র লিখতে হ'বে তার কোন মানে নেই। চিঠির মধ্যে রোমান্স খুঁজে বেড়ান বাঙ্গালী জীবনের একটা বিশেষত্ব, ওটা শিক্ষিত অশিক্ষিত নেই ভদ্র অভদ্র নেই, চুপি চুপি চিঠি পড়া—। আমি বুঝতে পারিনে ওর মধ্যে কি মাধুর্য্য আছে।"—

—"এক মুখ দাড়ি নিয়ে নীতি জ্ঞান সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে লেকচার দিবিত চল, খুব হাত তালি পাবি।"

—"না না ভাই আমি তোমায় বিদ্রূপ করিনি, সত্যি আমি অনেক ভদ্র শিক্ষিতদের মধ্যেও ও জিনিষটার প্রাবল্য দেখেছি।

আমার বড্ড রাগ হয় ও রকম দেখলে, তুমি যেন নিজে গায়ে পেতে নিও না। ওঃ ওরা অনেকদূর এগিয়ে গেছে, চল একটু তাড়াতাড়ি।”

আরো খানিকটা দূর এগিয়ে যেতেই সুরেশের সঙ্গে দেখা— “এই যে বিনীতা দি কোন দিকে ?”

বিনীতা একটু হেসে বল্লে—“আপাততঃ তোমার দিকে, অপরন্থা কিং ভবিষ্যন্তি। তার পর বাড়ীর খবর কি ?”

—“বাড়ীর খবর ভালই। দাদা বুধবাবে দিল্লী যাবেন।”

বিনীতা একটু চুপ করে থেকে পরে ব'ল্লে—” ওঃ তাই নাকি ? বুধবারে কোন সময়, যে সময় আমি গিইছিলাম সেই সময় ?”

সুরেশ মাথা নেড়ে বল্লে—“হ্যাঁ।”

—“চল সুরেশ আমাব ওখানে, এখন তোমার কিছু কাজ আছে—?”

—“নাঃ কাজ বিশেষ কিছু নেই একবার লাইব্রেরীটা ঘুরে যাব, খান কতক বই নিয়ে। চলুন আপনার সঙ্গেই যাই।”

ওরা আবাব ফিরল, বাড়ী ফিরে বিনীতা সুরেশ কে নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকল,রেখারা ফিরে যাচ্ছিল,বিনীতা ওদের ডাকল— “এই ঘরেই বোসনা, চলে যাচ্ছ কেন।” ওবা সবাই এসে বসল।

মানুষের সঙ্গ যে মানুষের আমরণকাল কত প্রয়োজনীয় সেটা আজ বিনীতা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করছিল। তাই আজ ও যাকে সামনে পাচ্ছিল তাকেই কাছে ডাকছিল।

এতদিন অন্তর ছিল পূর্ণ, তাই সঙ্গ ওর প্রয়োজন ছিলনা, আজ শূন্যতায় ও হাঁপিয়ে উঠেছে তাই আজ ওর সঙ্গ চাই।

কিছুক্ষণ পরে সুরেশ উঠে গেল।

রাত্রির আহার সেরে অম্বা নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছিল, বিনীতা অন্ধকার ঘরে চুপ করে বসেছিল, অম্বাকে দেখে ডাকল—"অম্বা।"

—"কি ভাই ?"

প্রশ্ন করে অম্বা ওর ঘরে এসে ঢুকল, বিনীতার কপালে হাত রেখে বল্লে—"কি হয়েছে খেলেনা যে ?"

বিনীতা ওর হাতখানা নিজের কপালে চেপে ধরে বল্লে—"কিছুই হয়নি, আজ খেতে ইচ্ছে করছেনা, আজ সকালে যে লঙ্কা খাইয়েছ সেটাকে হজম করছি। সে যাহোক তোমার বালিশটা নিয়ে এসো—আজ তোমার আমার ফুল শয্যা—থুড়ি শূন্য শয্যা, কি বল !"

অম্বা হেসে বল্লে—"যো হুকুম।"

অম্বা চলে গেল।

বালিশটা ধপাস করে বিনীতার শয্যার একপাশে ফেলে অম্বা লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল।

—"নাঃ, এ রকম করে আর চলছে না, এ যেন সেই 'ভোজনং যত্র তত্র, শয়নং হট্ট মন্দিরে' হয়েছে।"

বিনীতা হাসল—"তাহ'লে কি করা উচিত ?"

অম্বাও হেসে উঠল—"কি করা উচিত সে আবার বলে দিতে হ'বে নাকি ? বিয়ে করা উচিত।"

—"করবে নাকি শিগগির ?

—"কোরবো বইকি।"

—"তার পর দেশের কাজ ?"

—"দেশের কাজও কোরবো।"

"ছেলের কান্না থামিয়ে, সংসারের কাজ করে সময় থাকবে ?"

"কেন থাকবে না, ইচ্ছে থাকা চাই। দেশের কাজ করতে হ'লে অবিবাহিত কেন থাকতে হবে আমি বুঝতে পারিনে, স্ত্রীব জন্য মাকে, কিম্বা মায়ের জন্য স্ত্রীকে ত্যাগ করা যেমন অন্যায় অশোভন এবং আশ্চর্য্যকর, এও কি ঠিক তাই নয় ? . দু' জনকে নিয়ে চলতে গেলে হয়ত অনেক বাধা বিপত্তি আসবে, কিন্তু অমন কাপুরুষ হ'লে চলবেনা সে বাধা লঙ্ঘন করতে হ'বে। গ্যারিবলডির জীবনী খানা বাংলা দেশের প্রত্যেক স্ত্রী পুরুষকে আমি পড়তে বলি, প্রাণ ভয়ে যখন পালিয়ে যাচ্ছেন নদী সাঁতরে, তখনও গলায় তাঁর পুত্র বাঁধা। আমার এত সুন্দর লাগে, সে দেশ মায়ের বীর সন্তান নয়, সে মায়ের ছেলে, স্ত্রীর স্বামী, পুত্রের শুধু পিতা।"

বিনীতা ক্লান্ত স্বরে হেসে বল্লে—"আগাগোড়া তারা যদি বা পড়িত,

গ্যারিবলডীর জীবন চরিত,

তাহ'লে তাহারা কি যেন করিত কেদারা হেলান দিয়ে।" ঠিক তাই নয় কি ভাই ?"

—"তোমায় গুলি করা উচিত, এমন অপ্রস্তুত করে দাও।"

বলে অম্বা হেসে উঠল।

বিনীতাও হাসল, বল্লে—"না ভাই তোর মত অমি অস্বীকার করি নে, কিন্তু সকলের আদর্শ এক নয়।',

—"তোমার ঘুম আসছে নাকি বিনীতা অমন জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলছ যে ?

—"না ঘুম আসছেনা ত, তোমার লেকচার শুনছি তন্ময় হয়ে।"

অম্বা বিনীতার হাতে ঈষৎ ঠেলা দিয়ে বল্লে

—"অত তন্ময়তা ভাল নয়, একটু সামলে।"

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অম্বা বল্লে—

—"সবারি আদর্শ যে এক নয় বল্লে, কিন্তু এ বিষয়ে ওটা তোমার বলা ভুল। আদর্শ এ বিষয়ে সবারি এক তবে অবস্থা এক নয়। যথার্থ অবিবাহিত তারাই থাকতে পারে যারা পাগল কিম্বা মহাপুরুষ।

তুমি শুধুই স্বপ্নবিলাসী তাই আমার কথা ঠিক বুঝতে পারছ না কিম্বা চাইছ না। অবশ্য স্বপ্নটার ও প্রয়োজন আছে, নইলে সংসার একটা স্থূল বাস্তবতার কদর্য্যরূপ নিয়ে নিশ্বাস আটকে দেয়, কিন্তু স্বপ্ন কতটুকু ভাল জান? যেমন আমাদের কল্পনার যে প্রিয় আছে তাকে নিয়ে সংসার করা চলে না, তাই বাস্তব প্রিয়েরও প্রয়োজন হয়, কিন্তু কল্পনার প্রিয়কে ত্যাগ করিনে, বাস্তবের প্রিয়কে কল্পনার প্রিয়ের মধ্যে মিশিয়ে সুন্দর করি।"

—"আজ কি সমস্ত রাত বক্তৃতা দেবে। বিয়েটাতে আপাততঃ এখুনি পালিয়ে যাচ্ছে না। আজ বক্তৃতা রেখে ঘুমিয়ে পড়; আর যদি থামতে না ইচ্ছে হয়, তবে চল টাউনহলে যাই, এমন কথাগুলো ঘরের কোণে বলার চাইতে টাউনহলে দাঁড়িয়ে বল্লে তবু দেশের দশের উপকার হবে।"

বলে বিনীতা একটু হাসলে।

অম্বাও হেসে উঠল—"পোড়ারমুখী।"

—"দেখ ভাই অম্বা তোমার ঐ ঠানদিদির মত গাল দিয়ে আদর ভদ্র সমাজে অচল।"

—"না ভাই তোমাদের ওসব নব্য ভব্য আড়ষ্ট ভাবে এটিকেট্ রক্ষা করা আমার পোষায় না, আমি এই রকম করেই কথা কইব, তোমার যদি কানে বাজে ত তুমি ভবিষ্যতে আমার সামনে যখন আসবে কানে তুলো গুঁজে এসো।"

হাওড়া ষ্টেশনে নরেশ দাঁড়িয়েছিল, পাশে সুরেশ এবং শৈলেশ্বর বাবু দাঁড়িয়ে, ট্রেন ছাড়তে একটু দেরী আছে, হঠাৎ পেছন থেকে কে ডাকল—"নরেশ।"

নরেশ ফিরে চাইল—"কে বিনীতা এসো।"

শৈলেশ্বর বাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—

—"তোমার বিনীতার সঙ্গে দেখা করে আসা উচিত ছিল নরেশ, দেখ দিখি এখানে ও দেখা করতে এল। এখন ও ট্রেন ছাড়বার দেরী আছে চল আমরা ঐখানে গিয়ে বসি গে।"

ওঁরা চারজনে একখানা বেঞ্চি দখল করে বসে পড়লেন।

সুরেশ শৈলেশ্বর বাবু মাঝে মাঝে দু'একটা কথা বলছিলেন, নরেশ বিনীতা দু'একটা 'হুঁ, হ্যাঁ' ছাড়া বিশেষ কিছু কথা কইছিল না।

ওরা উভয়ে উভয়ের মুখের দিকে মাঝে মাঝে চেয়ে দেখতে লাগল, যেমন করে শ্যামা ধরিত্রীর সঙ্গে অস্তরবির দৃষ্টি বিনিময় হয়।

ট্রেনের সময় হয়ে এল, বিনীতা নরেশের পায়ে হাত দিয়ে মাথায় ছুঁইয়ে প্রণাম করল, নিঃশব্দে নরেশ শুধু নিজের হাতখানা ওর মাথায় রাখল।

নরেশ পিতাকে প্রণাম করল।

ওরা তিনজনে চুপ করে প্লাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে রইল, ট্রেনখানা আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল। বিনীতা শৈলেশ্বর বাবুকে একটা প্রণাম করে বেরিয়ে গেল।

… … … …

এবার বিনীতা সমস্ত দিন কাজ নিয়ে ঘুরতে লাগল, ওর মনে মনে আশা ছিল ও কাজের মধ্যে নিজেকে ভুলতে পারবে, কিন্তু এতবড় ক্ষতটাকে ভুলে থাকা সেকি সোজা কথা! দিন কতকের মধ্যে ওর দেহমন ক্লান্তিতে ভরে এল। ও আর পারে না এমন দুঃসহ জীবন বয়ে বেড়াতে, এই কি ও চয়েছিল? এই কি ওর এতদিনের সাধনার পুরস্কার দিল ভগবান।

রেখা বলে—"তোমার আজ কাল কি হয়েছে ভাই?"

—"কই কি হয়েছে?"

বিনীতা ঘুরে আবার প্রশ্ন করে।

—"কি হয়েছে তা তুমি নিজে বুঝতে পার না!

—"কই নাত।"

—"ওঃ অবস্থা এতদূর খারাপ! তাহলে বিয়ে করে ফেল—সব সেরে যাবে।"

বিনীতা হেসে বল্লে—"নিজের করতে ইচ্ছে হচ্ছে বুঝি।"

রেখা হাত দু'খানা জোর করে কপালে ঠেকিয়ে বল্লে—"রক্ষে কর ভাই।"

… … … …

বিনীতার দাদা শচীপতি অনেক দিন ধরেই ওকে নিজের কাছে ডাকছিলেন চিঠিতে, এবার ছোট ভাই রতিপতিকে পাঠিয়ে দিলেন বিনীতাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে। এমন করে আর চলছিল না, বিনীতাও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, ও নিজের কাজ রেখাকে বুঝিয়ে, রতিপতিকে নিয়ে দাদার কাছে চলল।

দাদার আনন্দের সংসারে হয়ত ওর জীবনের একটা শান্তির অধ্যায় আরম্ভ হ'তে পারে সেই আশায়।

অনেকদিন পরে বিনীতা দাদার কাছে এসে দাঁড়াল, নত হয়ে প্রণাম করতেই শচীপতি তাড়াতাড়ি ওকে দুই হাতে কোলের মধ্যে টেনে নিলেন।

মাথার ওপর সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বল্লেন—"কি চেহারাই হয়ে গেছেরে তোর!"

বিনীতা একটু হাসলে।

আবার কিছুকাল চুপ করে থেকে শচীপতি বল্লেন—"বিনু আর এমন করে ঘুরিস নে ভাই; তোর অমতে আমি কোন বিষয়ে জেদ কোরবো না, তুই আমার কাছে থাক। এতদিন ধরে আমার কিরকম মনের অবস্থা গেছে সে শুধু ভগবানই জানেন।"

বলে উনি নিবিড় ভাবে বিনীতাকে কোলের মধ্যে টেনে নিলেন।

—"না দাদা এবার তোমার কাছেই থাকবো।"

শচীপতি লোকটি মন্দ নন, কিন্তু বিনীতার সঙ্গে যে মতান্তরের সৃষ্টি হয়েছিল, তা স্নেহ দয়া মায়া হীন নির্ম্মমতার জন্যে নয়, সে শুধু যুগ যুগান্তর ধরে যারা প্রভূত পরিমাণে প্রভুত্ব করে এসেছে, তারা একদিনে প্রভুত্ব ছেড়ে বন্ধুত্ব গ্রহণ করতে পারে না, সেই অন্তরের পুরুষ প্রভুর প্রভুত্বের অবমাননায় ওদের মতান্তরের সৃষ্টি হয়েছিল।

শচীপতির স্ত্রী যোগমায়া পল্লীগ্রামের মেয়ে, এখন কিন্তু দেখলে বোঝা যায় না, গ্রামের সহজ সারল্য ওঁর মধ্যে নেই, শুধু

আধুনিক কথাবার্ত্তা চাল চলনের মধ্যে থেকে গদার মা মাঝে মাঝে আবির্ভূ‌র্তা হন, সেটা বোঝা যায় ওঁর অকারণ কলহ-প্রিয়তার থেকে। ওঁর বাঁকা সিঁথি, ওঁর কাধের সেফটিপিন ভুলেও কখন স্থানভ্রষ্ট হয় না।

ওঁর শিক্ষার মাপকাঠি সাজসজ্জা।

'মাগো, ও নাকি আবার শিক্ষিতা, কি সাজ করেছিল!"

এ কথা ওঁর মুখে অনেক সময় শোনা যেত।

ওঁর বিবাহিত জীবনের প্রথম অধ্যায় থেকেই বিনীতার ওপর প্রবল বিতৃষ্ণা ঘটেছিল, তার কারণ হচ্ছে এই, বাড়ী শুদ্ধ সকলেই, শ্বশুর শাশুড়ী স্বামী যে যখন যে কাজ করতেন তাতেই বিনীতার ডাক পড়ত। 'বলতো বিনীতা এটা কি রকম করা যায়!' 'বিনীতার বেশ পছন্দ আছে।'

ইত্যাদি কথা শুনে শুনে এবং সেই সঙ্গে যখন যোগমায়ার সাজ শয্যা থেকে লেখা-পড়া পর্য্যন্ত বিনীতার ওপর ভার পড়ল তখন বধূ যোগমায়ার মনে হতে লাগল স্বামী এবং অন্যান্য সকলে বুঝি ওর পৈত্রিক গ্রাম্যতা এবং ওর বিদ্যার অভাব জেনেই এ ব্যবস্থা কচ্ছেন—তারই এটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ।

এবার বিনীতার আসার পর প্রথমটা সে চুপ করেই ছিল; কিন্তু ক্রমে ক্রমে যখন জানতে পারল বিনীতা দিন কতকের জন্য আসেনি, থাকবে বলে এসেছে, তখন ওর বহু কালের রুদ্ধ আক্রোশ ক্রমাগত বেরিয়ে পড়তে লাগল শ্লেষ রূপে।

শচীপতি আহারে বসেছেন সামনে বসে বিনীতা পাখাখানা নাড়ছিল, যোগমায়া কি একটা কাজে ঘরে এসে ঢুকল, শচীপতি মুখ তুলে যোগমায়ার দিকে চেয়ে বল্লেন—"সেবা যত্নে আজকাল

বিনীতা ঠিক আমাদের মায়ের ধারা পেয়েছে; ওকে দেখলেই আমার মায়ের কথা মনে পড়ে।"

শচীপতি মুখ নীচু করে আহারে মন দিলেন। যোগমায়ার মুখ ক্রমশঃ গম্ভীর হয়ে উঠছিল, শচীপতি তা লক্ষ্য না করলেও, বিনীতার দৃষ্টি এড়াল না, সে অপ্রস্তুত মুখে কথাটা ঘুরিয়ে নেবার জন্যে বল্লে—"ওটা আর একটু এনে দেব দাদা!"

—"দে।"

বলে শচীপতি একটু হেসে বল্লেন—"তুই এসে পর্য্যন্ত আমার খাওয়া আজ কাল ছোট খাট ভীমের আহার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার খাওয়া দেখে আমিই অবাক হয়ে যাই।"

যোগমায়া এতক্ষণ চুপ করে স্বামীর কথা শুনছিল, এবার ও অধৈর্য্য হয়ে পড়ল, স-বিদ্রূপে হেসে বল্লে—

—"তবু ভাল, যাক তুমিও তাহলে প্রশংসা করতে জান।" যোগমায়া ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

শচী পতি গম্ভীর হয়ে মুখ নীচু করে আহারে মন দিলেন, অপ্রস্তুত বিনীতা হতাশ হয়ে ভাবে শান্তি কি ঈশ্বর ওর চারিপাশে কোথাও রাখবেন না; ও নিজের অশান্তির বেড়াজাল ছিঁড়ে ছুটে এসেছিল শান্তির আশায়, আর এখানেও ওকেই কেন্দ্র করে ওদের দাম্পত্য-জীবনের ত্রুটীটা এমনি ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে।

রতুর ঘরে বসে বিনীতা শচী পতির মেয়ে সীতার ফ্রকে ফুল তুলছিল, রতু বিছনার ওপর শুয়ে কি একখানা বই পড়ছিল, পাশের ঘরে যোগমায়া উকিল মণীন্দ্র বাবুর স্ত্রী আশালতার সঙ্গে

গল্প করছিল, সীতা পাশের বাড়ীর ডাক্তার বাবুর ছেলে আশীষের সঙ্গে বাগানে ছুটা-ছুটি করছিল।

ডাক্তার বাবুর চাকর এসে অশীষকে ডাকল—"চল মা ডাকছেন।"

আশীষ চলে গেল।

সীতা কিছুক্ষণ বাগানের মধ্যে একলা খেলা করে বেড়াতে লাগল, তার পর হঠাৎ ছুটে এসে মাকে জড়িয়ে ধরল।

—"মা আমার ক্ষিদে পেয়েছে।"

যোগমায়া আশালতার সঙ্গে গল্প করছিল কথা থামিয়ে মুখ ফিরিয়ে হঠাৎ ওর পিঠে সজোরে একটা চড় বসিয়ে দিলে—"বুড়ো মেয়ে দিন দিন ধিঙ্গি হচ্ছেন, মেরে হাড় ভেঙ্গে দেব। আমি সকলকার মত অত আদিখ্যেতার ধার ধারিনে।"

আশালতা সীতাকে কোলের কাছে টেনে নিলেন

—"আহা ছেলে মানুষ! এইত দুষ্টুমী করবার সময়।"

—"এখন থেকে শাসন না করলে দেখছ ত ভাই। সব বিষয়ে ছেলে বেলা থেকে আস্কারা দিয়ে দিয়ে এখন যা ইচ্ছে তাই করে বেড়াচ্ছেন। জেল খেটে হৈ হৈ করে বংশের মুখ পুড়িয়ে বেড়াচ্ছেন।

ওঁর মত ভাই বলে তাই আজো এত কাণ্ড করছেন ঐ বোনের জন্যে—। আমার বাপের বাড়ী হ'লে ও-রকম মেয়েকে ধরে আস্ত পুঁতে ফেলত।"

কথাগুলো ওদের দুই ভাই-বোনের কানে যাচ্ছিল। রতু বিনীতার মুখের দিকে নিরুপায় ভাবে চাইতে চাইতে বেরিয়ে গেল।

যে গ্লানির প্রতিকারের উপায় নেই, তার জন্যে মুখের সান্ত্বনা দিতে যাওয়াও ধৃষ্টতা !

আজ চোখের জলে বিনীতার মনে হ'ল ঈশ্বর ওকে কেন বধির করলেন না !

এমনি করেই বৎসর শেষ হয়ে গেল, ও আর যেন থাকতে পারছিল না, ও বুঝতে পারছিল সংসারের সুখের আশ্রয় ওর জন্য নেই, আবার পূর্ব্ব জীবনে ফিরতে ইচ্ছা হচ্ছিল।

সেদিন ও শচীপতির শাসন কাটিয়ে সচ্ছন্দে সহজে চলে যেতে পেরেছিল,কিন্তু আজ শচীপতির সস্নেহ বন্ধন কাটিয়ে চলে যেতে পারে এত বড় হৃদয়হীন ও নয়। এমনি করেই দোটানার মধ্যে দিনের স্রোত বয়ে যাচ্ছিল, হয়ত আরো কাটত।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বিনীতা চুল আঁচড়াচ্ছিল, শচীপতি এসে ঘরে ঢুকলেন—"বিনীতা তোর নামে একখানা টেলিগ্রাম আছে।"

বিনীতা চিরুণীখানা রেখে হাতটা মুছতে মুছতে জিজ্ঞাসা করল—"কার ?"

—"কি জানি ভাই, আমি খুলিনি, এই নে দেখ।" শচীপতি খামখানা বিনীতার হাতে দিলেন। টেলিগ্রাম খানা খুলে বিনীতা পড়ে শচীপতির হাতে দিল, শচীপতি জিজ্ঞাসা করলেন—"লতিকা কে ভাই ?"

—লতিকা শৈলেশ্বর বাবুর বড় ছেলে নরেশের স্ত্রী।"

—"মাসীমার বুঝি খুব অসুখ তাই তোকে যেতে লিখেছে, তা কি করবি ?"

বিনীতা চুলটা জড়াতে জড়াতে বল্লে—"আমি যাব দাদা আজকের ট্রেনেই।"

শচীপতি বোনের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

২২

দিন দিন সত্যবালার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে উঠছিল। নরেশকে জানান হয়েছিল, নরেশ কিন্তু অন্যরকম ভাবছিল, ও ভাবছিল, ওকে গৃহে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই বুঝি মার অসুখের অজুহাত দেওয়া হ'চ্ছে।

দুটো তিনটে বালিশ পর পর উঁচু করে রেখে তারই ওপর ভর দিয়ে বসে সত্যবালা হাঁপাচ্ছিলেন। পাশে বসে সত্যদাসী ওঁর পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল।

সুরেশ মায়ের পায়ের কাছে চুপ করে বসেছিল। শৈলেশ্বর বাবু চেয়ারটাকে খাটের কাছে টেনে এনে বসলেন।

—"ওঃ ভগবান আর পারি নে!" বলে সত্যবালা আবার হাঁপাতে লাগলেন।

—"বড্ড কষ্ট হচ্ছে? সুরেশ ডাক্তার রায়কে আর একবার ফোন করে দাও।"

সত্যবালা একবার স্বামীর দিকে চাইলেন।

লতিকা আহারে বসেছিল, সুরেশ এসে দাঁড়াল—"বৌ দি।"

—"কি ভাই। মার কাছে কে আছে?" লতিকা মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করল।

—"মার কাছে বাবা আছেন, সত্যদাসী আছে, আমি সেই জন্যই একবার উঠে এলাম।"

—"এসো।"

বলে লতিকা একখানা আসন বাঁহাতে দেবরের দিকে ছুঁড়ে দিল—"পেতে বোস ভাই।"

সুরেশ সেখানাকে পেতে বসে বল্লে—"দাদার বন্ধু প্রশান্ত বাবুকে চেন।"

—"হ্যাঁ চিনি, তা কি হয়েছে?"

—"তিনি দিল্লী গিইছিলেন, দিন কতক হ'ল ফিরেছেন, আজ তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল বল্লেন—দাদার চেহারা বিশ্রি হয়ে গেছে, মাঝে মাঝে জ্বর হ'চ্ছে।"

"ফেরবার কথা কিছু বলেছেন?"

—"আমি জিজ্ঞেস করলাম, তা বল্লেন এখন কিছুদিন ওখানেই থাক্‌বেন বলেছেন।"

—"এরকম করে আর কদিন চলবে ভাই, মার যে অবস্থা তাতে প্রত্যেক মুহূর্ত্ত কাটছে তবে মনে হ'চ্ছে যে এ-মুহূর্ত্তটা কাটল। একটা অকারণ খেয়ালের জন্যে একটা প্রাণ যাবে ভাই!"

লতিকার চোখে জল ভরে এল।

অনেকক্ষণ পরে লতিকা মুখ তুল্ল—"ঠাকুর পো তুমি একবার রেখার কাছ থেকে বিনীতার ঠিকানাটা নিয়ে এসো, বিনীতাকে আমার নামে একটা টেলিগ্রাম করে দাও ভাই।"

—"তা দিচ্ছি বৌদি, কিন্তু শুধু বিনীতাদিকে এনে কি লাভ?"

—"তুমি দাও, লাভ আছে বইকি, আমি ত আর পাগল নই যে শুধু শুধু বিনীতাকে ডাকব।"

... ...

লতিকা নীচে নামছিল সিঁড়ির নীচে বিনীতা এসে দাঁড়াল। লতিকা তাড়াতাড়ি সিঁড়ি কটা নেমে নীচে এল।

—"ব্যাপার কি ভাই, মাসিমা কেমন আছেন ?"

"মা আজ অন্যদিনের চেয়ে ভাল আছেন, দেখবে চল।"

লতিকা আবার ফিরে ওকে সঙ্গে নিয়ে ওপরে উঠতে লাগল।

—"আমাকে টেলিগ্রাম করলে যে ?"

আশ্চর্য্য স্বরে বিনীতা প্রশ্ন করলে।

—"সে হবে খন পরে—তুমি এখন একটু জিরোও।"

বলে লতিকা বিনীতার হাতখানা চেপে ধরল।

সত্যবালা চোখ বন্ধ করে ক্লান্ত ভাবে চুপ করেছিলেন, ওদের পদশব্দে চোখ চাইলেন, বিনীতা ওর পাশে বসে পড়ে ওঁর হাতখানা ধরে, হাতের ওপর হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বল্লে—"একি হয়ে গেছেন মাসিমা।"

সত্যবালার চোখে ক্ষীণ ক্লান্ত হাসি ফুটে উঠল—"আর যাবার সময় হয়ে এল যে মা।"

লতিকা ওর পায়ের কাছে বসে পড়ে পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বল্লে—"কি যে বল মা।"

ক্ষমার মা মেঝেয় বসেছিল, বল্লে—"যা বলেছ বৌ ঠাকরুণ, হাগা মা তোমার কি এখন যাবার সময়, রোগ হয়েছে সেরে যাবে, তা'বলে অমন অলুক্ষুণি কথা বল কেন ? এখন ছোট দাদাবাবুর বৌ আসুক নাতি নাত্নী নিয়ে ঘর সংসার কর।"

... ...

রাত্রে আহারাদির পর শৈলেশ্বর বাবু এবং সুরেশ সত্যবালার ঘরে এলেন, সত্যবালা ঘুমচ্ছিলেন, ওপাশের কৌচখানাতে শৈলেশ্বরবাবু শুয়ে পড়লেন, সুরেশ লতিকাকে আস্তে আস্তে বল্লে—"বৌদি তোমরা যাও।"

প্রথম রাত্রে স্থরেশ মায়ের কাছে থাকে, শেষরাত্রে লতিকা থাকে।

লতিকা বিনীতাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। গভীর অন্ধকার রাত্রি আকাশের গায়ে গায়ে তারার আলোক চিহ্ন ও যেন কত যুগ যুগান্তের পায়ের চিহ্ন।

আজও থেমে যাবে না, ও যে পান্থ ওকে চলতে হ'বে, সর্ব্ব বাধা উল্লঙ্ঘন করে।

ওকে চলতে হ'বে আগুনের মধ্যে দিয়ে, পর্ব্বত লঙ্ঘন করে, সমুদ্র পার হয়ে, ও কবেকার কোন প্রথম প্রভাতে বেরিয়েছিল অরূপের সন্ধানে, ওকে চলতে হ'বে, এখনও যে ও তার সন্ধান পায়নি; শুধু নরেশের জন্যে ও থামতে পারে না।

ওরা দুজনে ছাতে উঠে চুপ করে বসে ছিল, অনেকক্ষণ পরে লতিকা বিনীতার হাতখানা চেপে ধরে বললে—"দেখছত ভাই মায়ের অবস্থা—এরকম ভাবে বেশী দিন রাখা যাবে না। শুধু ছেলে খেলার জন্যে একটা প্রাণ যাবে। তুমি একখানা চিঠি লিখে দাও, এখানকার সব অবস্থা জানিয়ে ফিরে আসতে। দেবে ভাই?"

—"আমি!"

বিনীতা বিহ্বল ভাবে বলে চুপ করে রইল। আবার কিছুক্ষণ লতিকা বিনীতার দিকে চেয়ে রইল। ঝোঁকের মাথায় কথাটা হঠাৎ বলে ফেলে লতিকা নিজেও অপ্রতিভ হয়ে পড়ল, ও বুঝতে পারল কথাটা যে ভাবে বলা উচিত ছিল সে ভাবে ও বলেনি। একটু খানি থেকে বিনীতার বিহ্বল বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে লতিকা আবার বল্লে—"দেবে বল?"

—"কি বলছ লতিকা !"

বিনীতা ব্যাকুল ভাবে বলে উঠল।

এতক্ষণ পরে লতিকা পূর্ণ দৃষ্টিতে বিনীতার মুখের দিকে চাইল, বল্লে—"না ভাই আমি পাগল নই, কি বলছি সেকি তুমি বুঝতে পারছনা। আমার কথা ভুলে যাও—শুধু মনে কর মায়ের কথা—আর।—

একটু থেমে নিজের কণ্ঠকে সংযত দৃঢ় করে নিয়ে লতিকা বল্লে—"আর তাঁর কথা যিনি নিজেকে ভোলাবার মিথ্যা মোহে সংসারে নিজেকে এত বড় অপরাধী করে তুলবার উপক্রম করেছেন।"

—"কিন্তু কেন এ ভুল তোমার! আমি তাঁর কে?"

—"তুমি তাঁর কে?"

লতিকা মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে পরে বল্লে—"সে কি তুমি জান না। মন্ত্রের দাবীব চেয়ে প্রাণের দাবী ঢের বড সে আমি প্রতিমুহূর্ত্তে প্রতিক্ষণে অনুভব করেছি! আমি ক্লান্ত হয়েছি,যথার্থ ক্লান্ত হয়েছি, তুমি আমাকে মুক্তি দাও ভাই।"

গভীর উত্তেজনায় লতিকার কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল। বিনীতা দুইহাতে মুখ ঢাকা দিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

অনেকক্ষণ দু'জনেই স্তব্ধ হয়ে বসে রইল, কতক্ষণ পরে লতিকা বিনীতার অঙ্গ স্পর্শ করে শান্ত কণ্ঠে বল্লে—"বল?"

—"কি বলবো?"

অশ্রু রুদ্ধ কণ্ঠে বিনীতা বল্লে।

—"তোমার স্থান তুমি ফিরিয়ে নাও, আমাকে ছুটী দাও। আমি দুঃখ পাব? হয়ত পাব—কিন্তু মস্ত বড় গ্লানির হাত থেকে

মুক্তি পাব বিনীতা! অন্তরের রাজ্যে কি জোর চলে ভাই! না ভিক্ষা চলে! না পাওয়ার দুঃখ সে ত সম্পদ, কিন্তু জোর করে যে পাওয়া তার গ্লানির কি শেষ আছে! ভিক্ষা যে দেয় সেও ছোট হয় যে নেয় সেও ছোট হয়! বল্ল তুমি আমাকে গ্লানির থেকে মুক্তি দেবে না ভাই?"

লতিকা আস্তে আস্তে বিনীতাকে কাছে আকর্ষণ করে নিল।

বিনীতা একটা কথাও বল্লে না শুধু তার অবাধ্য চোখের জল নিঃশব্দে ঝরে পড়ল লতিকার কোলের ওপর।

... ...

সবাইকে অবাক করে লতিকাই প্রধান উদ্যোগী হয়ে বিনীতার সঙ্গে নরেশের বিয়ে দিয়ে দিল।

তারপর আবার দিন কাটে। শীতের রৌদ্রজ্জ্বল অপরূপ মধ্যাহ্নে হাতে পাতা খোলা গীতা খানা নিয়ে নিজের ঘরে খোলা জানালার ওপর বসে লতু দূরের দিকে চেয়ে থাকে।

রৌদ্র স্নাত সতেজ শ্যামল গাছগুলি অপূর্ব্ব আনন্দে মর্ম্মর রব তোলে।

ও পাশের ঘর থেকে বিনীতার সকৌতুক কণ্ঠস্বর ভেসে আসে—"আঃ, কি হ'চ্ছে! গেল আমার চুল গুলো সব, ছাড়।"

লতিকা চকিত হয়ে ব্যাকুল মনোযোগে খোলা পাতার দিকে চেয়ে আবৃত্তি করলে—

—"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

একবার দু'বার তিনবার কণ্ঠ আবৃত্তি করে চলে,
আনমনা আঁখি কখন খোলা পাতা ছেড়ে চলে যায় দূরে—বহু
দূরে যেখানে ধরিত্রীর প্রেমে আকাশ নত হয়ে এসেছে !
কণ্ঠস্বর শিথিল হয়ে আসে, এক বিন্দু জল চোখের কোণে
অস্পষ্ট আভাসে ফুটে ওঠে।
খোলা গীতা কোলের ওপর পড়ে থাকে নীরব অহ্বানে

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদযাজী মাং
নমস্কুরু।
মামে বৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে
প্রিয়োহসি মে ॥
সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং
শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বা সর্ব্ব পাপেভ্যো
মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

সম্পূর্ণ